পর্দাপ্রথার গোড়ার কথা

রাকীব আল হাসান

প্রথম প্রকাশ
একুশে বই মেলা ২০২৩

প্রকাশক
এস. এম. সামসুল হুদা

তওহীদ প্রকাশন
১৩৯/১ তেজকুনী পাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা-**১২১৫**
tawheedprocation@gmail.com

প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ
মো. হেলাল উদ্দীন

বর্ণবিন্যাসঃ
রিয়াদুল হাসান

মুদ্রকর
জে.এস.এ প্রিন্টার্স
৮৬, খন্দকার ভবন, আরামবাগ, মতিঝিল, ঢাকা

মূল্য: ২০০ টাকা

উৎসর্গ

সেই সংগ্রামী নারীদেরকে
যারা নারীবিদ্বেষী ফতোয়াবাজদের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে
ইসলামের প্রকৃত শিক্ষাকে মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দিচ্ছেন।

বিসমিল্লাহির রহমানের রহিম।

আল্লাহ বলেন, "বলো, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য সাজসজ্জার যে সব উপকরণ সৃষ্টি করেছেন এবং যে সব পবিত্র খাদ্যদ্রব্য সৃষ্টি করেছেন তা নিষেধ করেছে কে?[১] রসুলাল্লাহ (সা.) বলেছেন, "তোমরা খাও, পান করো, পরিধান করো এবং দান করো, তবে অপচয় ও অহংকার পরিহার করো"[২]। কোর'আনের এ আয়াত ও হাদিস অনুসরণ করে ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, "যা ইচ্ছা খাও, যা ইচ্ছা পরিধান করো, যতক্ষণ না দু'টো জিনিস তোমাকে বিভ্রান্ত করে- অপব্যয় এবং অহংকার"[৩]।

রসুলাল্লাহ (সা.) আরবের আইয়্যামে জাহেলিয়াতের যে সমাজে জন্মগ্রহণ করেছিলেন সেই সমাজে নারীদের কোনো সম্মান ছিল না, ইজ্জত ছিল না। কোনো পরিবারে কন্যাশিশু জন্মগ্রহণ করলে সেই পরিবারের সকলের মুখ কালো হয়ে যেত। আর কন্যাশিশুকে জীবন্ত কবর দেওয়া ছিল নিত্য দিনের ব্যাপার। গোত্রে গোত্রে নারীদের নিয়ে কোন্দল হত, শক্তিশালী গোত্রের লোকেরা দুর্বল গোত্রে কোনো সুন্দরী নারী থাকলে তাকে ভোগ করার জন্য আক্রমণ করত। এ ভয়েও অনেকে কন্যাসন্তান হত্যা করত। নারীদের দেহপসারিনী বাঈজী হিসাবে ব্যবহার করা হত। এমনকি পবিত্র কাবায় উলঙ্গ হয়ে হজ করতেও বাধ্য করা হত। এমন অন্ধকারাচ্ছন্ন সময়ে রসুলাল্লাহ (সা.) এসেছিলেন সমাজকে আলোকিত করতে। তিনি তাঁর জীবনের অক্লান্ত পরিশ্রম, অসম্ভব অধ্যবসায়, ত্যাগ-কোরবানির বিনিময়ে যে সমাজ নির্মাণ করলেন সেখানে নারীদের দেওয়া হলো ন্যায্য অধিকার, উচ্চ-সম্মান, পূর্ণ নিরাপত্তা। নারীরা সমাজের সকল কাজে অংশগ্রহণ করার সুযোগ পেল। তারা তাদের প্রতিভা, জ্ঞান, দক্ষতার বিকাশ ঘটানোর সুযোগ পেল। পারিবারিক কাজ থেকে শুরু করে সাধারণ উপার্জনের কাজে যেমন নারীদের অংশগ্রহণ ছিল তেমনি অংশগ্রহণ ছিল বাজারব্যবস্থাপনা, হাসপাতালব্যবস্থাপনা, চিকিৎসাসেবা, শিক্ষকতা এমনকি জীবনের সবচেয়ে কঠিন ও দুঃসাহসিক জায়গা যুদ্ধক্ষেত্রেও নারীদের অংশগ্রহণ ছিল নিয়মিত ব্যাপার। নারীরা কেবল যুদ্ধে অংশগ্রহণ নয় বরং এমন বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন যে অনেক

১। সুরা আরাফ: ৩২

২। সহী বুখারি, পোশাক-পরিচ্ছদ অধ্যায়, হাদিস নং- ২৩৩০

৩। সহী বুখারি, পোশাক-পরিচ্ছদ অধ্যায়, হাদিস নং- ২৩৩০

যুদ্ধে পুরুষদেরকেও ছাড়িয়ে গেছেন। উহুদ যুদ্ধ থেকে এসে রসুলাল্লাহ (সা.) উম্মে আম্মারার বীরত্বের প্রশংসা করে বলেছিলেন, আজ যুদ্ধে যেদিকে তাকিয়েছেন সেদিকেই কেবল উম্মে আম্মারাকেই দেখেছেন তিনি। আর ইয়ারমুকের যুদ্ধে যখন পুরুষ সাহাবারা পিছু হটে যাচ্ছিলেন তখন নারীরা তাবুর খুঁটি তুলে প্রশিক্ষিত রোমান সৈন্যদের বিরুদ্ধে যে ভূমিকা রেখেছিলেন তা ইতিহাসে বিরল। তাদের সেই ভূমিকার কারণেই সে যুদ্ধের মোড় ঘুরে যায় এবং মুসলমানরা বিজয় পতাকা ছিনিয়ে আনে।

কিন্তু সময়ের চাকা যতই ঘুরেছে ইসলাম ততই তার প্রকৃত রূপ থেকে দূরে সরে গিয়েছে। নারীদের পর্দা সংক্রান্ত ও ব্যক্তিগত জীবনের খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে হাজার হাজার মাসলা-মাসায়েল নিয়ে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে বিরাট বিরাট কেতাবের পাহাড় গড়ে তোলা হয়েছে। ফলে সহজ সরল ইসলাম বিকৃত, বিপরীতমুখী, জটিল ও দুর্বোধ্য হয়ে গেছে। এখন এই যুগে এসে সেই মাসলা-মাসলায়েলগুলো দেখে অনেকে ইসলামকে নারী-নিগ্রহকারী, নারী-অধিকার হরণকারী ও পুরুষতান্ত্রিকতার হেফাজতকারী একটি প্রাচীনপন্থী ধর্ম বলে অভিযোগ তুলছেন। তারা মনে করছেন ইসলাম নারীকে আপাদমস্তক কালো কাপড়ে আবৃত করে রাখতে চায়, গৃহবন্দি করে রাখতে চায়, তার অবদানকে রান্নাঘরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ করতে চায়। কিন্তু তারা ক'জন আর তলিয়ে দেখেন যে, ধর্মের বিকৃত মাসলা-মাসায়েল দিয়ে নারীদেরকে এভাবে শত শত বছর পশ্চাদপদ করে রেখেছে মূলত ধর্মব্যবসায়ী ফতোয়াবাজ গোষ্ঠী? এর দায় ইসলামের নয়, কোর'আনের নয়। ধর্মব্যবসায়ীদের সৃষ্ট এই ফতোয়ার নিগড় থেকে মুক্ত হতে গিয়েই পাশ্চাত্যের প্রদর্শিত অশ্লীল জীবনাচরণের ফাঁদে পা দিয়েছে নারীরা। তারা যে আবার সেখানে গিয়ে মানুষের মর্যাদা হারিয়ে পণ্যেই পরিণত হয়েছে সেটা তারা উপলব্ধি করতে পারছে না। তাদেরকে আধুনিকতা ও স্বাধীনতার নামে আরেকটি ভারসাম্যহীন জীবন উপহার দিচ্ছে পশ্চিমা জীবনদর্শন।

ইসলামে দুর্বোধ্য, জটিল, কঠিন বিধান থাকতে পারে না

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ দীন বা জীবনব্যবস্থা।[৪] এ দীনকে অন্যান্য সমস্ত জীবনব্যবস্থার উপরে অর্থাৎ সমগ্র পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা করার জন্য শেষ নবী মোহাম্মাদুর রসুলাল্লাহকে পাঠানো হয়েছে,[৫] কেবলমাত্র ব্যক্তিগতভাবে পালন করার জন্য এ দীন প্রেরণ করা হয়নি। যে দীনটি সমগ্র মানবজাতির জন্য, সমগ্র পৃথিবীর জন্য পাঠানো হয়েছে স্বাভাবিক জ্ঞানেই বোঝা যায় সেটি হতে হবে অতি সহজ-সরল, কারণ দীন যদি কঠিন হয়, দুর্বোধ্য হয় তাহলে একইসাথে শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ধনী-দরিদ্র, সাদা-কালো, মেরু-মরু অঞ্চলের মানুষ, ব্যবসায়ী-কৃষক-দিনমজুর-চাকুরিজীবী, নারী-পুরুষ এক কথায় সমগ্র মানবজাতি যথাযথভাবে পালন করতে পারবে না। এজন্য এ দীনকে মহান আল্লাহ অত্যন্ত সহজ-সরল (সিরাতাল মুস্তাকীম) করে তৈরি করেছেন[৬]। সহজ-সরল দীন বলতে প্রথমত এ দীনটি বোঝা সহজ হবে এবং দ্বিতীয়ত মান্য করাও সহজ হবে। এ দীন বোঝা যে সহজ তা আল্লাহ পরিষ্কারভাবে বলে দিয়েছেন। তিনি বলেন, "তিনি কোর'আনকে সহজ করে দিয়েছেন বোঝার জন্য। অতএব, উপদেশ গ্রহণ করার মতো কেউ আছে কি?"[৭] আর এ দীন পালন করা যে সহজ সেটা বোঝা যায় কোর'আনের বহু আয়াত থেকে, তার মধ্য থেকে একটি আয়াত উল্লেখ করা হলো- আল্লাহ বলেন, "হে মো'মেনগণ, যখন তোমরা সালাতের জন্য ওঠো, তখন স্বীয় মুখমণ্ডল ও হস্তসমূহ কনুই পর্যন্ত ধৌত কর এবং পদযুগল গিটসহ। যদি তোমরা অপবিত্র হও তবে সারা দেহ পবিত্র করে নাও এবং যদি তোমরা রুগ্ন হও অথবা প্রবাসে থাক অথবা তোমাদের কেউ প্রসাব-পায়খানা সেরে আসে অথবা তোমরা স্ত্রীদের সাথে সহবাস কর, অতঃপর পানি না পাও তবে তোমরা মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করে নাও। অর্থাৎ স্বীয় মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয় মাটি দ্বারা মুছে ফেল। আল্লাহ তোমাদেরকে অসুবিধায় ফেলতে চান না; কিন্তু তোমাদেরকে পবিত্র রাখতে চান এবং তোমাদের প্রতি স্বীয় নেয়ামত পূর্ণ করতে চান। যেন তোমরা কৃতজ্ঞাতা প্রকাশ কর"[৮]। বান্দার যেন এ দীনের

৪। সুরা মায়েদা: ৩

৫। সুরা তওবা: ৩৩, সুরা ফাতাহ: ২৮, সুরা সফ: ৯

৬। সুরা ফাতিহা: ৫

৭। সুরা ক্বামার: ১৭

৮। সুরা মায়েদা: ৬

কোনো বিষয় মানতে কষ্ট না হয় সেজন্য তিনি কত সহজ করে দিলেন, তিনি এও বলে দিলেন যে, তিনি মানুষদেরকে অসুবিধায় ফেলতে চান না। এবার এ হাদিসটি লক্ষ করুন, "আয়েশা (রা.) বলেন, রসুলাল্লাহ (সা.) কে দুটি বিষয়ের যে কোনো একটি গ্রহণের এখতিয়ার দেওয়া হলে তিনি অধিক সহজটি গ্রহণ করতেন, যদি তা গোনাহের কাজ না হত। গোনাহের কাজ হলে তিনি তা থেকে সর্বাধিক দূরে অবস্থান করতেন"।[৯] সহজটা কেন বেছে নিতেন? কারণ হলো- উম্মাহ তাঁকেই অনুসরণ করবে। তিনি যদি সহজটা বেছে নেন তাহলে উম্মাহর জন্য পরবর্তীতে মানা সহজ হবে। এখান থেকে পরিষ্কার হলো যে, এ দীন অত্যন্ত সহজ-সরল, একে দুর্বোধ্য, জটিল করার কোনো সুযোগ নেই। কিন্তু বাস্তবতা হলো বর্তমানে ইসলামের নামে যে দীনটি ব্যক্তিগতভাবে পালন করা হচ্ছে তা গত চৌদ্দশো বছর ধরে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে করে অত্যন্ত কঠিন, দুর্বোধ্য, জটিল করে ফেলা হয়েছে। আল্লাহর রসুল (সা.) বিদায় নেওয়ার ৬০/৭০ বছর পর ইসলামের প্রকৃত আকিদা এ জাতির সামনে থেকে হারিয়ে যায়। এর কয়েকশ বছর পর জাতির মধ্যে জন্ম নিতে থাকে শত শত ফকিহ, মুফাসসির, মুহাদ্দিস যাদের কাজই ছিল দীনের বিভিন্ন বিষয়ের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে মাসলা-মাসায়েল আবিষ্কার করা। আল্লাহ পবিত্র কোর'আনে দীন নিয়ে বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করেছেন[১০] এবং আল্লাহর রসুলও বিদায় হজের ভাষণে দীন, জীবনব্যবস্থা নিয়ে বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করেছেন। বাড়াবাড়ি অর্থ হচ্ছে অতি বিশ্লেষণ এবং যতটুকু বলা হয়েছে তার চেয়ে বেশি বেশি করা, আধিক্য (তাশাদ্দুদ) করা। এমন কোনো কাজ দেখলে রসুলাল্লাহ রেগে লাল হয়ে যেতেন এবং যারা তা করত তাদেরকে কঠিনভাবে তিরস্কার করতেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক ইতিহাস হচ্ছে, গত কয়েক শতাব্দী থেকে সেটাই সবচেয়ে বেশি করা হয়েছে। অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কোনো বিষয়ে মাসলাহ জানতে চাইলে বিশ্বনবী (দ.) প্রথমে তা বলে দিতেন। কিন্তু কেউ যদি আরও একটু খুঁটিয়ে জানতে চাইত তাহলেই তিনি রেগে যেতেন। একজন সাহাবা তাকে একটু খুঁটিয়ে প্রশ্ন করাতে তিনি উষ্মাভরে বলেছিলেন- তোমাদের পূর্ববর্তী অনেক জাতি তাদের নবীদের এমনি করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রশ্ন করত, তারপর

৯। সহী বুখারি, মানাকিব অধ্যায়, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৩৮৫; সহী মুসলিম, কিতাবুল ফাদায়েল, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৮০

১০। সুরা মায়েদা: ৭৭, ৮৭, সুরা নিসা: ১৭১

সেই উত্তরগুলো নিয়ে নানা গবেষণা করে মতভেদ সৃষ্টি হত, এর ফলে তারা ধ্বংস হয়ে গেছে। তোমাদের যতটুকু করতে বলা হয়েছে তোমরা ততটুকু করতে চেষ্টা করো, এতেই তোমাদের কল্যাণ নিহিত, বেশি প্রশ্ন না করে।[১১]

কিন্তু তাঁর অত ক্রোধেও, অত নিষেধেও কোনো কাজ হয়নি। তাঁর জাতিটিও ঠিক পূর্ববর্তী নবীদের (আ.) জাতিগুলোর মতো দীন নিয়ে অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করে অতি মুসলিম হয়ে মাসলা-মাসায়েলের তর্ক তুলে বিভেদ সৃষ্টি করে। অতি-বিশ্লেষণকারী আলেম, পণ্ডিত, ফকিহগণ দীনের প্রায় প্রত্যেকটি বিষয় নিয়ে বাড়াবাড়ি করে। খাবার-দাবার থেকে শুরু করে, দাড়ি, টুপি, লেবাস, আঞ্চলিক সংস্কৃতির চর্চা, গান-বাজনা, টাখনু, কুলুখ, অজু-গোসল, দোয়া-কালাম, যিকির-আজগার, নামাজ, রোজার ইত্যাদির মাসলা মাসায়েল নিয়ে ব্যাখ্যা, অতি ব্যাখ্যা, আরো ব্যাখ্যা করে করে সরল দীনটাকে ভীতিকর, জটিল, দুর্বহ বানিয়ে ফেলে। সবচেয়ে বেশি বাড়াবাড়ি করা হয়েছে নারীর হেযাব নিয়ে। অতিবিশ্লেষণ, তর্ক-বাহাস ও বাড়াবাড়ির ফলে হেযাব সংক্রান্ত যে পাহাড়সম মাসলা-মাসায়েল জমা হয়েছে এ লেখায় চেষ্টা করা হয়েছে সেই পাহাড়ের নিচ থেকে প্রকৃত ইসলামের সহজ-সরল হেযাবের নীতিটাকে তুলে ধরা। দীর্ঘদিন থেকে দেখে আসা, পালন করে আসা একটা রীতির বিরুদ্ধে নতুন একটা মতকে (আসলে হারিয়ে যাওয়া) প্রতিষ্ঠিত করতে হলে বেশ শক্ত যুক্তি, তথ্য, রেফারেন্স প্রয়োজন। বিষয়টি মাথায় রেখে আলোচনা করা হয়েছে।

হেযাবের অর্থ

হেযাব শব্দের আক্ষরিক অর্থ হচ্ছে পর্দা, আবরণ, আচ্ছাদন ইত্যাদি। পবিত্র কোর'আনে আল্লাহ হেযাব শব্দটি ব্যবহার করে দুটি জিনিস বা বিষয়ের মধ্যে কোনো জিনিস দ্বারা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করাকে বুঝিয়েছেন। কোর'আনের বিভিন্ন আয়াত থেকে হেযাবের অর্থ আরো স্পষ্ট রূপে বোঝা যায়। আল্লাহ বলেন, "তারা বললো, তুমি যার প্রতি আমাদের আহ্বান করছ সে বিষয়ে আমাদের অন্তর আচ্ছাদিত, কর্ণে বধিরতা এবং তোমার ও আমাদের মাঝে অন্তরাল (হেযাব)। সুতরাং তোমরা তোমাদের কাজ করো, আমরা

১১। ইবনে মাসুদ (রা.) থেকে বোখারী

আমাদের কাজ করি।"[১২] অনত্র তিনি বলেন, "ওহীর মাধ্যম ছাড়া অথবা পর্দার অন্তরাল (হেযাব) ব্যতিরেকে কোনো মানুষের সাথে কথা বলার নিয়ম আল্লাহর নেই।"[১৩]

"অপরাহ্নে যখন তার সম্মুখে খুব শিক্ষিত সুসজ্জিত দ্রুতগামী ঘোড়া উপস্থিত করা হলো, তখন সে বললো, আমি তো আল্লাহর স্মরণ হতে বিমুখ হয়ে ঐশ্বর্যপ্রীতিতে মগ্ন হয়ে পড়েছিলাম, এদিকে সূর্য অস্তমিত (হেযাবাবৃত) হয়ে গেল।"[১৪] অর্থাৎ হেযাব দ্বারা কেবল নির্দিষ্ট কোনো কাপড়কে বোঝায় না। যা দুটি জিনিসের মধ্যে পূর্ণ-প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে তাই হেযাব। এখানে হেযাব বলতে মানুষ বুঝবে এমন একটি ব্যবস্থা যা নারী ও পুরুষের মাঝে একটি প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে যেন তারা পরস্পরকে কু-প্রবৃত্তি দ্বারা প্ররোচিত করতে না পারে। আল্লাহর হুকুম মানার ব্যাপারে সতর্কতা (তাকওয়া), দৃষ্টিকে সংযত রাখা, লজ্জাস্থানের হেফাজত করা, আল্লাহর স্মরণ (যিকির), শালীন পোশাক, সদাচরণ, মার্জিত চলাফেরা, শ্লীল কথা বলা এ সবই হেযাবের অন্তর্ভুক্ত।

হেযাবের আকিদা

ইসলামের একটি মৌলিক নীতি হলো- যে কোনো বিষয়ে আমল করার পূর্বে আকিদা বুঝে নেওয়া। কারণ আকিদা ভুল হলে ঈমানের কোনো দাম থাকে না আর ঈমান মূল্যহীন হলে আমলেরও কোনো মূল্য থাকে না। কাজেই হেযাবের আকিদা বা উদ্দেশ্য বুঝে নেওয়া জরুরি।

হেযাবের উদ্দেশ্য নারীকে গৃহবন্দি করা বা বোরখাবৃত করা নয় বরং নারী ও পুরুষ উভয়ের চলাফেরা, আচার-আচরণ, পোশাক-পরিচ্ছদ, কথা-বার্তা ও কাজ-কর্মে শালীনতার চাদর পরিয়ে দেওয়া। নারী ও পুরুষ যদিও একই সত্তা থেকে সৃষ্টি হয়েছে তবু তারা সম্পূর্ণ বিপরীত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ভিন্ন দুটি সত্তা। এ চমকপ্রদ বিষয়টিকে আল্লাহ তাঁর একটি নিদর্শন বা আয়াত বলে কোর'আনে উল্লেখ করেছেন। বিপরীত বৈশিষ্ট্য ধারণ করার জন্যই নারী

১২। সুরা হামিম: ৫

১৩। সুরা শুরা: ৫১

১৪। সুরা সাদ: ৩১-৩২

ও পুরুষের পারস্পরিক আকর্ষণ চিরন্তন ও প্রাকৃতিক। এ আকর্ষণ থেকে যেন কোনো বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি না হয়, মানুষ যেন প্রবৃত্তির পূজায় লিপ্ত না হয়, যেন কোনো ফেতনা বা অশান্তি সৃষ্টি না হয় সেজন্য কিছু নীতিমালা ও বিধিনিষেধ আল্লাহ নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্য ঠিক করে দিয়েছেন। এ বিধিনিষেধগুলোই হেযাবের নীতি। হেযাবের এ বিধিনিষেধগুলো আল্লাহ এজন্য দিয়েছেন যে, নারী ও পুরুষ পরস্পরকে দেখে, পরস্পরের সাথে কথা বলে, একসাথে কাজ করতে গিয়ে, বিশেষ কোনো আচরণে যেন কারো মধ্যে যৌন উদ্দীপনা সৃষ্টি না হয়, মনের মধ্যে কু-প্রবৃত্তির জন্ম না নেয়। বর্তমানে হেযাব বলতে কেবল নারীকে বোরখাবৃত করাকেই বোঝায় কিন্তু বাস্তবে দৃষ্টিকে সংযত করা, লজ্জাস্থানের হেফাজত করা, পোশাককে শালীন করা, কারো গৃহে প্রবেশের পূর্বে অনুমতি নেওয়া, নির্জনে পরপুরুষ বা পরনারীর (গায়রে মাহরাম) সাথে সময় অতিবাহিত করা থেকে বিরত থাকা, অশালীন (যৌন উদ্দীপনা সৃষ্টিকারী) বাক্যালাপ থেকে বিরত থাকা ইত্যাদি হলো হেযাবের মৌলিক নীতি। হেযাবের এই মৌলিক নীতিগুলো রক্ষা করা নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্যই বাধ্যতামূলক, ফরজ।

হেযাবের আকিদার বিকৃতি

বর্তমানের বিকৃত আকিদায় হেযাব হলো এমন একটি পোশাক যা নারীদেরকে আপাদমস্তক ঢেকে ফেলবে, নখের ডগা থেকে চুলের আগা পর্যন্ত কিছুই দেখা যাবে না। চোখের তারাটাও যেন কেউ দেখতে না পারে সেজন্য কালো গ্লাস পরলে হেযাব যেন আরও পাকাপোক্ত হয়। নারীরা কোনোভাবেই গৃহ থেকে বের হবে না, নিতান্তই যদি বাধ্য হয় তখন আপাদমস্তক আবৃতকারী পোশাক পরিধান করবে। হেযাবের এ নীতি যে সমাজে পূর্ণরূপে বাস্তবায়ন করা যাবে সেই সমাজের নারীরা (অর্থাৎ অর্ধেক জনসংখ্যা) সমাজের কোনো কাজে অংশগ্রহণ করতে পারবে না। তারা কেবল গৃহাভ্যন্তরে রান্না-বান্না আর গৃহস্থলীর কাজ সম্পাদন করবে। হেযাবের এই বিকৃত আকিদায় নারীরা মসজিদে প্রবেশ করতে পারবে না, ঈদগাহে যেতে পারবে না, জুমার নামাজে যেতে পারবে না, জানাজায় অংশ নিতে পারবে না, মুর্দা দাফন করতে পারবে না অর্থাৎ ধর্মীয়, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক কোনো কাজেই নারীরা অংশগ্রহণ করতে পারবে না। এ নীতি সমগ্র মুসলিম বিশ্বের ধর্মীয় অঙ্গনে

সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত হয়েছে, মধ্যপ্রাচ্যের কিছু দেশে জাতীয়ভাবেও এ নীতি প্রতিষ্ঠিত। এর ফলে সমগ্র পৃথিবীর সফল নারীদের (বিজ্ঞানী, সাহিত্যিক, নোবেলজয়ী, চলচ্চিত্রনির্মাতা ইত্যাদি) একটা বিরাট তালিকা করলেও সেখানে মুসলিম নারীদের নাম প্রায় শূন্যের কোঠায়। মুসলিম নারীদের মধ্যে যাও দু'একজন সফল নারী খুঁজে পাওয়া তারা আবার ধর্মীয় নেতাদের দৃষ্টিতে মুসলিমই নন, কারণ তারা পর্দা করেন না। এখন মুসলিম জাতিকে যদি এই দৈন্য দশা থেকে মুক্তি পেতে হয় তাহলে নারীদেরকে অর্থাৎ পিছিয়ে পড়া অর্ধেক জনসংখ্যাকে জাগ্রত করা অপরিহার্য। তার মানে এই নয় যে, তাদেরকে ইসলাম ত্যাগ করতে হবে বরং প্রকৃত ইসলাম নিয়ে দাঁড়াতে হবে। ইসলামের সঠিক ব্যাখ্যা দিয়ে বিকৃত আকিদার হেযাবের বেড়াজাল ছিন্ন করে নারীদেরকে শালীনতার সাথে সকল কাজে অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে।

হেযাব সম্পর্কে কোরআন যা বলে

পবিত্র কোর'আনে দু'টি সুরায় পর্যায়ক্রমে হেযাবের বিধান সংবলিত আয়াত নাজিল হয়েছে। সে সুরা দুটি হচ্ছে সুরা আহযাব এবং সুরা নুর। যদিও কোর'আন সংকলনে সুরা আহযাবের অবস্থান সুরা নুরের পরে কিন্তু সুরা আহযাবের হেযাব সংক্রান্ত আয়াতগুলো মূলত সুরা নুরের হেযাব সংক্রান্ত আয়াতের আগে নাজিল হয়েছিল। আহযাবের ৫৩ নং আয়াত এসেছিল খন্দকের যুদ্ধের ঠিক পরবর্তী সময়ে। আর নুরের ৩০ নং আয়াত আয়েশা (রা.) এর ইফকের ঘটনার পর পর। কোর'আনে হেযাবের বিধান আসা শুরু হয় কী প্রেক্ষাপটে তা একটু আলোচনা করে নেওয়া প্রয়োজনীয়।

রসুলাল্লাহ (সা.) মদিনায় হেযরত করার পর সেখানে তিনি ইসলাম প্রতিষ্ঠার অগ্রযাত্রা বেগবান করেন এবং সাহাবাদের নিয়ে একটি মসজিদ নির্মাণ করলেন যা মসজিদে নববী নামে খ্যাত। এ মসজিদই ছিল নবগঠিত ঐ রাষ্ট্রের রাজনৈতিক, সামরিক, প্রশাসনিক, বিচারিক ও ধর্মীয় কর্মকাণ্ডের মূল কেন্দ্র বা সদরদপ্তর। এ মসজিদের সাথেই নির্মাণ করা হয়েছিল রসুলাল্লাহ (সা.) এর স্ত্রীগণের থাকার ঘর। এখানে রসুলাল্লাহ (সা.) এর আলাদা কোনো কক্ষ ছিল না, তাই তিনি একেক দিন একেক স্ত্রীর কক্ষে থাকতেন।

দিন যত যাচ্ছিল ইসলাম প্রতিষ্ঠিত এ রাষ্ট্রের পরিধি ততই বৃদ্ধি পাচ্ছিল, ফলে সমস্ত দিক দিয়ে মদিনা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠা শুরু করে। দূর-দূরান্ত থেকে রসুলাল্লাহর সাথে সাক্ষাতের জন্য মানুষ মসজিদে নববীতে এসে ভীড় জমাতে থাকে। এ অবস্থায় রসুলাল্লাহ (সা.) এর সাথে সাক্ষাৎ ও বিভিন্ন আলোচনার জন্য তাঁর স্ত্রীগণের কক্ষগুলোতে জনসাধারণ অবাধে প্রবেশ করতে থাকে। ক্রমবর্ধমান হারে লোকজন তাদের ধর্মীয়, রাজনৈতিক, সামাজিক, ব্যক্তিগত সমস্যা ইত্যাদির জন্য রসুলাল্লাহর কাছে আসতে শুরু করেন। তাদের মধ্যে কেউ কেউ রসুল (সা.) এর অধিকতর মনোযোগ লাভের জন্য রসুলাল্লাহর স্ত্রীগণের শরণাপন্ন হতেন। যে কারণে একদিকে নবীর পারিবারের ব্যক্তিগত জীবনযাপন দারুণভাবে বিঘ্নিত যেমন হচ্ছিলো, তেমনি সব ধরনের মানুষের অবাধ প্রবেশের সুযোগে নবী-পত্নীদের পবিত্র চরিত্রের উপর মুনাফিকদের দ্বারা গুজব ছড়িয়ে দেবার সুযোগ সৃষ্টি হবার আশঙ্কা তৈরি হচ্ছিল। যা উম্মাহর মধ্যে বিভক্তির কারণ হয়ে উঠতে পারে। এ ধরনের সমস্যা দেখে ঘনিষ্ঠ সাহাবাগণের মধ্যে কেউ কেউ চিন্তিত হচ্ছিলেন। এরূপ অবস্থা ঠেকানোর উদ্দেশ্যে উমর (রা.) নবীপত্নী ও কন্যাদের প্রতি পর্দা করার প্রস্তাব রসুলাল্লাহ (সা.) এর কাছে উপস্থাপন করেন। উমর (রা.) থেকে বর্ণিত এ হাদিস থেকে আমরা সেটাই জানতে পারি- "তিনি (উমর) বলেন, আমি রসুল (সা.)কে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রসুল! আপনার কাছে সৎ ও অসৎ লোকেরা আগমন করে, আপনি যদি আপনার স্ত্রীদেরকে পর্দা পালন করার আদেশ দিতেন! তখন আল্লাহ পর্দার আয়াত অবতীর্ণ করেন।"[১৫] ইসলামের অন্যান্য হুকুম আহকামের মতো হেযাবের হুকুমটিও প্রয়োজন ও পরিস্থিতি অনুসারেই নাজিল হয়। আল্লাহ যে কোনো হুকুম প্রথমত রসুলাল্লাহকে (সা.) পালন করতে নির্দেশ দিয়েছেন, এরপর তাঁর পরিবারের সদস্যদেরকে সে নির্দেশের আওতায় নিয়ে আসার নির্দেশ করেন এবং পরবর্তীতে সারা মুসলিম সমাজকে সে নির্দেশের আওতায় নিয়ে আসার হুকুম করেন। এ নির্দেশ আবার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ধাপে ধাপে প্রতিষ্ঠা করেন। এজন্য ইসলামকে প্রাকৃতিক দীন বা দীনুল ফিতরাত বলা হয়ে থাকে। নিম্নে দুই সুরার হেযাব সংক্রান্ত আয়াতগুলো যে ক্রমানুযায়ী নাজিল হয়েছিল সেভাবে তুলে ধরা হলো-

প্রথম ধাপে সুরা আহযাবের ৩২ ও ৩৩ নং আয়াত নাজিল হয় যা ছিল কেবল রসুলাল্লাহ (সা.) এর স্ত্রীগণের প্রতি হেযাবের নির্দেশ। এ আয়াতে

১৫। সহী বুখারি, তাফসির অধ্যায়, সুরা আহযাব, ১০ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ১৪৬

আল্লাহ বলেন, "হে নবীর স্ত্রীগণ! তোমরা সাধারণ নারীদের মতো নও। যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় করে থাকো, তবে পরপুরুষের সাথে কোমল ও আকর্ষণীয় (যৌন উদ্দীপনামূলক) ভঙ্গিতে কথা বলো না, ফলে সেই ব্যক্তি কুবাসনা করতে পারে যার অন্তরে ব্যাধি রয়েছে, তোমরা সঙ্গত কথাবার্তা বলবে। তোমরা নিজেদের গৃহাভ্যন্তরে অবস্থান করো এবং পূর্বের জাহেলি যুগের মতো নিজেদেরকে প্রদর্শন করে বেড়িও না।"

এ আয়াত দু'টি যে কেবলই নবী-পরিবারের জন্য এতে কোনোরূপ সন্দেহের অবকাশও আল্লাহ রাখেননি। তিনি একাধিকবার তাঁদেরকে এ আয়াতের মধ্যে সম্বোধন করে বিধান প্রকাশ করেছেন। তথাপিও তাফসিরকারকগণ এ আয়াতের বিধানাবলীকে সাধারণ নারীর উপর চাপিয়ে দিতে উদগ্রীব। যেমন তাফসিরে জালালাইনে বলা হচ্ছে, এ আয়াতে নবী পত্নীদেরকে সম্বোধন করা হলেও বিধান পৃথিবীর সকল নারীদের জন্য প্রয়োজ্য।

দ্বিতীয় ধাপে রসুলাল্লাহ (সা.) এর স্ত্রীগণ ও মো'মেন পুরুষদের মধ্যে হেযাবের বিধান সংবলিত আদেশ দিলেন, "হে ঈমানদারগণ! নবী গৃহে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করো না, নবীর স্ত্রীদের কাছে যদি তোমাদের কিছু চাইতে হয় তাহলে পর্দার পেছন থেকে চাও।"[১৬] অবাধে রসুলাল্লাহ (সা.) এর স্ত্রীদের কক্ষে জনসাধারণের প্রবেশের ফলে রসুলাল্লাহ (সা.) এর পারিবারিক জীবনযাপনে যে সমস্যা তৈরি হয়েছিল এবং মুনাফিকদের দ্বারা রসুলাল্লাহ (সা.) এর স্ত্রীদের উপর কালিমা লেপনের যে সম্ভাবনা পরিলক্ষিত হচ্ছিল তা এ আয়াত নাজিলের মাধ্যমে আল্লাহ বন্ধ করে দেন।

তৃতীয় ধাপে আল্লাহ মো'মেন নারীদের উদ্দেশ্যে হেযাবের বিধান প্রেরণ করেন। গৃহের বাইরে গেলে নারীরা কীভাবে হেযাব করবে তার নির্দেশনা এ আয়াতে সুস্পষ্টভাবে আল্লাহ ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, "হে নবী আপনি আপনার পত্নীগণকে ও কন্যাগণকে এবং মো'মেনদের স্ত্রীগণকে বলুন, তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দাংশ নিজেদের উপর টেনে নেয়। এতে তাদের চেনা সহজ হবে, ফলে তাদের উত্যক্ত করা হবে না, আল্লাহ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।"[১৭]

১৬। সুরা আহযাব: ৫৩

১৭। সুরা আহযাব: ৫৯

এ আয়াতে আল্লাহ নারীদেরকে চাদর বা ওড়নার মতো একটি বাড়তি বস্ত্রখণ্ড দিয়ে নিজেদেরকে শালীনভাবে আবৃত্ত করার জন্য বললেন যেন তাদের দ্বারা যৌন আবেদন সৃষ্টি না হয়। এবং তার সাথে আরো একটি বিষয় এ আয়াতে যুক্ত রয়েছে, সেটি হলো যা পরিধান করা হলে তাদেরকে চেনা সহজতর হবে সে বিষয় খেয়াল রাখতে হবে। এতে করে এটা সুস্পষ্ট হয় যে, নারীদেরকে মুখমণ্ডল ঢেকে রাখতে বলা হয়নি। কারণ মুখমণ্ডল ঢেকে রাখা হলে চেনা সম্ভব না তা সাধারণ জ্ঞানে বোঝা যায়।

এর বেশ কিছুদিন পরে নাজিল হয় সুরা নুরের হেযাব সংক্রান্ত আয়াতগুলো যা সমগ্র উম্মাহর জন্য প্রযোজ্য। আল্লাহ বলেন, "হে ঈমানদারগণ! নিজেদের গৃহ ছাড়া অন্যের গৃহে প্রবেশ করো না যতক্ষণ না গৃহবাসীদের সম্মতি লাভ করো এবং তাদেরকে সালাম দাও। এটিই তোমাদের জন্য ভালো পদ্ধতি, যাতে তোমরা স্মরণ রাখো। তারপর যদি সেখানে কাউকে না পাও, তাহলে তাতে প্রবেশ করো না যতক্ষণ না তোমাদের অনুমতি না দেওয়া হয়। আর যদি তোমাদের বলা হয়, ফিরে যাও তাহলে ফিরে যাও, এটিই তোমাদের জন্য শালীন ও পরিচ্ছন্ন পদ্ধতি এবং যা কিছু তোমরা করো আল্লাহ তা ভালোভাবেই জানেন। যে গৃহে কেউ বাস করে না, যাতে তোমাদের সামগ্রী আছে এমন গৃহে প্রবেশ করাতে তোমাদের কোন পাপ নেই এবং আল্লাহ জানেন তোমরা যা প্রকাশ কর এবং যা গোপন কর।"[১৮]

এ আয়াতের পরে হেযাব সংক্রান্ত সর্বশেষ আয়াতগুলো নাজিল হয় যেখানে মো'মেন নারী এবং পুরুষদের হেযাব কেমন হবে তা সুস্পষ্টরূপে বর্ণিত হয়েছে। এ আয়াতের পরে হেযাবের ব্যাপারে আর বাড়াবাড়ি, অতিব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের কোনো প্রয়োজনই থাকে না। আল্লাহ বলেন, "মো'মেনদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি নত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গের হেফাযত করে। এতে তাদের জন্য পবিত্রতা আছে। নিশ্চয় তারা যা করে আল্লাহ তা অবহিত আছেন।"[১৯]

পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ বলেন, "ঈমানদার নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে এবং তাদের যৌন অঙ্গের হেফাযত করে। তারা যেন যা সাধারণতঃ প্রকাশমান, তা ছাড়া তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে

১৮। সুরা নুর: ২৭-২৯

১৯। সুরা নুর: ৩০

এবং তারা যেন তাদের ওড়না বক্ষদেশে ফেলে রাখে এবং তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুস্পুত্র, ভগ্নিপুত্র, স্ত্রীলোক, অধিকারভুক্ত বাঁদী, যৌনকামনামুক্ত পুরুষ ও বালক, যারা নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ, তাদের ব্যতীত কারো কাছে তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে, তারা যেন তাদের গোপন সাজসজ্জা প্রকাশ করার জন্য জোরে পদচারণা না করে। মো'মেনগণ, তোমরা সবাই আল্লাহর সামনে তওবা কর, যেন তোমরা সফলকাম হও।"[২০]

অর্থাৎ নারীরা তাদের সাধারণ প্রকাশমান অঙ্গগুলোকে উন্মুক্ত রাখতে পারেন। চেনার জন্য মুখ খোলা রাখা, খাওয়ার জন্য, শ্বাস গ্রহণের জন্য নাক মুখ খোলা রাখা, কাজ করার জন্য হাত ও হাঁটার জন্য পায়ের প্রয়োজনীয় অংশ খোলা রাখা কি স্বাভাবিক নয়? এসব ঢেকে রাখা কি অসুবিধাজনক নয়? তাই আল্লাহ এসব ঢাকতে বলতে পারেন না, বললে সেটা অপ্রাকৃতিক হত। আর এসব যৌন আবেদনও সৃষ্টি করে না। আল্লাহ নারীর সাধারণ প্রকাশমান অংশ আবৃত করতে বলেননি। এখন কেউ যদি এসব ঢেকে রাখার ফতোয়া দেন তাহলে সেটাই হবে দীন নিয়ে বাড়াবাড়ি যা আল্লাহ হারাম করেছেন।

সমগ্র কোর'আনে হেযাব সংক্রান্ত এ আয়াতগুলো। যেখানে সাধারণ মো'মেন নারীদের পোশাক সম্পর্কিত নীতিমালা এসেছে মাত্র দু'টি আয়াতে। কিন্তু বর্তমানে ধর্মীয় ওয়াজ-মাহফিলগুলো শুনলে মনে হবে যে সমগ্র কোর'আনই বুঝি নারীদেরকে গৃহবন্দি করার জন্য নাজিল হয়েছে। বরং কোর'আন থেকে জানা যায় হেযাব নারীদেরকে গৃহবন্দি তো করেই না বরং নারীদের সম্মান, নিরাপত্তা ও পবিত্রতা রক্ষার জন্য এক প্রাকৃতিক, ভারসাম্যপূর্ণ, সহজ-সরল ব্যবস্থা।

সুরা নুরের এ আয়াতগুলো অত্যন্ত সুস্পষ্ট, সহজ-সরল। এটাকে যেন কেউ অতি বাড়াবাড়ি করে ভিন্ন অর্থ করতে না পারে এজন্য এ সুরার শুরুতেই আল্লাহ বলেছেন, "এতে আমি সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ অবতীর্ণ করেছি, যেন তোমরা স্মরণ রাখো"[২১]।

২০। সুরা নুরঃ ৩১

২১। সুরা নুরঃ ১

হেযাব সম্পর্কে হাদিস যা বলে?

এবার সহীহ হাদিসগ্রন্থগুলো থেকে জানার চেষ্টা করা যাক রসুলাল্লাহ (সা.) ও খুলাফায়ে রাশেদুনদের যুগের মো'মেন নারীরা কীভাবে হেযাব করতেন।

১. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে নাসাঈ বর্ণনা করছেন যে, বিদায় হজের প্রাক্কালে রসুল (সা.) এর উটে সহযাত্রী হিসাবে (তাঁর ভাই) ফজল বিন আব্বাস (রা.) ছিলেন। এ সময় ক্বাথ'আম গোত্রের এক রূপসী তরুণী রসুল (সা.)-কে কোনো এক বিষয়ে প্রশ্ন করে, তখন সেই রূপসী তরুণীর দিকে ফজল বিন আব্বাস (রা.) তাকিয়ে ছিলেন। তখন রসুল (সা.) তাঁর মুখ অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন।[২২]

এ প্রসঙ্গে আলী (রা.) এর বরাত দিয়ে তিরমিজি জানাচ্ছেন যে, ঐ সময় ফজল বিন আব্বাস (রা.) এর মুখ কেন ঘুরিয়ে দিচ্ছেন তা জানতে চেয়ে তাঁর বাবা আব্বাস (রা.) রসুল (সা.)-কে প্রশ্ন করেন-"ইয়া রসুলুল্লাহ, আপনি কেন আপনার ভাতিজার মুখ ঘুরিয়ে দিলেন?" উত্তরে রসুল (সা.) জানান-" তিনি আশঙ্কা করছেন যে, এ তরুণ-তরুণীর কারো মনে শয়তানের কুভাব প্রকাশ হতে পারে, তাই তিনি ফজলের মুখ ঘুরিয়ে দিয়েছেন।"

বহুবিদ্যা বিশারদ শাওক্বানী (রা.) বলেন যে- ইবনুল আল ক্বাতান (রা.) উপরের ঘটনা থেকে সিদ্ধান্ত নেন যে, মহিলাদের মুখের দিকে তাকানো বৈধ হবে, যদি যৌন আকাঙ্ক্ষার কোনো সম্ভাবনা না থাকে। এখানে লক্ষ করার বিষয় হলো-

(ক) যদি নারীদের মুখ দেখা নিষিদ্ধ হত তাহলে এত জনসমাগমের সামনে ফজল ইবনে আব্বাস (রা.) মহিলাটির দিকে তাকাতেন না।

(খ) যদি নারীদের মুখ দেখা নিষিদ্ধ হতো তাহলে ফজল ইবনে আব্বাস (রা.) এর পিতা আব্বাস (রা.) রসুল (সা.) কর্তৃক ফজল ইবনে আব্বাস (রা.) মুখ ফিরিয়ে দেওয়ার কারণ কী তা জানার জন্য প্রশ্ন করতেন না।

২২। বুখারি, হাদিস নং- ১৫১৩; মুসলিম, হাদিস নং- ১৩৩৪; আবু দাউদ, হাদিস নং- ১৮১১; নাসাঈ, হাদিস নং- ২৬১৩

(গ) যদি নারীদের মুখ ঢাকার নির্দেশ থাকত তাহলে রসুল ঐ সময় ঐ ক্বাথ'আম গোত্রের মহিলাকে কোনো কিছু দিয়ে তাঁর মুখমণ্ডল ঢাকতে নির্দেশ দিতেন।

বিদায় হজ ঘটেছিল হিজরির ১০ম সনে এবং হেযাবের আয়াত নাজিল হয়েছিল হিজরির ৫ম সনে, কাজেই ৫ম সনে যদি সব নারীদের প্রতি মুখ ঢাকার নির্দেশ হত তাহলে ১০ম হিজরির বিদায় হজ-কালে মুখ অনাবৃত নারীর দেখা পাওয়া যেত না। এর থেকে প্রমাণিত হয় যে হেযাবের আয়াতের পরও মহিলারা বাইরে মুখ খোলা রেখেই চলাফেরা করত।

২. আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন যে, আসমা বিনতে আবু বকর (রা.) পাতলা কাপড় পরিহিত অবস্থায় রসুল (সা.)-এর নিকট প্রবেশ করলে রসুল (সা.) তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বললেন, হে আসমা! নারী যখন যৌবনে পদার্পণ করে তখন তার এটা ওটা ব্যতীত প্রকাশ করা বৈধ নয়। তিনি চেহারা ও দু'কব্জির দিকে ইঙ্গিত করে দেখালেন।[২৩] এখানে রসুলাল্লাহ (সা.) পরিষ্কারভাবে বলে দিলেন যে, চেহারা ও হাত খোলা রাখা যাবে। এটাই আল্লাহ কোর'আনে বলেছেন, "সাধারণত যা প্রকাশমান সেগুলো খোলা রাখা যাবে।"[২৪]

৩. জাবির বিন আব্দুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, তিনি ঈদের দিনে রসুল (সা.)-এর সাথে সালাতে উপস্থিত ছিলাম। তিনি খুতবার পূর্বে আযান, ইকামত ব্যতীত সালাত আদায় করলেন। অতঃপর লোকদেরকে উপদেশ, নসিহত করলেন। অতঃপর মহিলাদের নিকট এসে ওয়াজ-নসিহত করে বললেন, হে মহিলারা! তোমরা সদকা করো, কেননা তোমাদের অধিকাংশই জাহান্নামের জ্বালানি হবে। লালচে দু'গালের অধিকারী একজন মহিলা নারীদের মধ্যে হতে দাঁড়িয়ে বললো, কেন হে আল্লাহর রসুল (সা.)? জবাবে তিনি বললেন- "তোমরা বেশি বেশি স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করে থাকো এবং তোমাদের মধ্যে বেশিরভাগ অকৃতজ্ঞ"। তখনই মহিলারা তাদের কানের দুল এবং আঙ্গুলের আংটি বেলাল (রা.) এর হাতের বস্ত্র খণ্ডে ছুঁড়ে ফেলতে লাগেন।[২৫]

২৩। আবু দাউদ, হাদিস নং- ৪১০৬; মিশকাত হাদিস নং-৪৩৭২, সনদ সহীহ

২৪। সুরা নুরঃ ৩১

২৫। সহিহ্ মুসলিম, হাদিস নং- ৮৮৫

এ হাদিস থেকে দু'টি বিষয় পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে, ঈদের নামাজে নারী-পুরুষ উভয়ই উপস্থিত হতেন এবং তাদের মাঝে কোনো পর্দা টাঙানো থাকত না এবং নারীদের মুখ নেকাব দ্বারা ঢাকাও থাকত না। কারণ পর্দা টাঙানো থাকলে অথবা মুখমণ্ডল ঢাকা থাকলে কীভাবে জাবির (রা.) ঐ নারীর চেহারা দেখতে পেলেন? কেউ আবার মনে করতে পারেন যে, হয়ত এ ঘটনা হেযাবের আয়াত নাজিলের পূর্বে ঘটেছিল। তাদের উদ্দেশে কথা হলো-

এই একই হাদিস কিন্তু বুখারিতে ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেছেন, সেখানে তিনি জাবির কর্তৃক বর্ণনার মতো বর্ণনা করে সংযোগ করেন- "তিনি দেখেন, মহিলারা হাত বাড়িয়ে তাদের গহনাদি বেলাল (রা.) এর মেলে ধরা কাপড়ের মধ্যে নিক্ষেপ করতে।" অর্থাৎ ইবনে আব্বাস (রা.) ঐ সময় ঐখানে উপস্থিত ছিলেন, এবং তিনি নিজে দেখেছেন মহিলারা হাত বের করে তাদের গহনাদি বেলাল (রা.)-এর মেলে ধরা কাপড়ে নিক্ষেপ করতে। কিন্তু রসুল (সা.) ইন্তেকালের সময় ইবনে আব্বাস (রা.) এর বয়স মাত্র ১৩/১৪ বছর ছিল। কাজেই হাদিস বর্ণনাকাল যদি হেযাবের আয়াত নাজিলের আগে হয় তাহলে ইবনে আব্বাস (সা.) তখন নিতান্ত ৫/৬ বছরের শিশু থাকার কথা এবং ঐ বয়সে দেখা কোনো ঘটনা তাঁর মনে থাকার সম্ভাবনা থাকে না। কাজেই এ ঘটনাকাল হেযাবের বিধান নাজিলের পরবর্তী সময়ের।

৪. উবায়দুল্লাহ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আরকাম যুহরীকে নির্দেশ দিয়ে লিখলেন যে, তিনি যেন সুবাইয়া বিনতে হারিস আসলামীর নিকট গমন করেন। এরপর তাকে তার হাদিস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। যখন তিনি রসুলুল্লাহ (সা.) এর নিকট ফতোয়া চেয়েছিলেন এবং তিনি তাকে যা বলেছিলেন তখন উমর ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উতবাকে লিখে পাঠালেন যে, সুবাইয়া তাকে জানিয়েছে- তিনি বনু আমির ইবনে লুঈ গোত্রের সা'দ ইবনে খাওলার স্ত্রী ছিলেন। তার স্বামীর ইন্তেকালের পরপরই তিনি সন্তান প্রসব করেন। এরপর যখন তিনি নিফাস থেকে পবিত্র হলেন, তখন বিয়ের পয়গামদাতাদের জন্য সাজসজ্জা করতে লাগলেন। তখন বনু আব্দুদ দার গোত্রের আবু সানাবিল ইবনে বাকাক নামক জনৈক ব্যক্তির নিকট গমন করলেন। তখন তিনি তাকে বললেন- মতলব কী? আমি তোমাকে সাজসজ্জা করতে দেখতে পাচ্ছি! সম্ভবত তুমি বিয়ের প্রত্যাশী? আল্লাহর শপথ! চার মাস দশ দিন অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত তুমি বিয়ে করতে পারবে না।

সুবাইয়া বললেন, যখন সে লোকটি আমাকে এ কথা বলল, তখন কাপড় চোপড় পরিধান করে সন্ধ্যাবেলা রসুলুল্লাহ (সা.) এর নিকট চলে এলাম। এরপর আমি তাঁকে সে বিষয়ে জানিয়ে দিলাম। তিনি আমাকে জানিয়ে দিলেন যে, সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সাথে সাথেই তোমার ইদ্দত পূর্ণ হয়ে গিয়েছে। তিনি আমাকে আরো নির্দেশ দিলেন যে, আমি ইচ্ছে করলে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারি।[২৬]

এ হাদিস থেকেও জানা গেল যে সুবাইয়া সন্তান প্রসবের পর অন্যত্র বিয়ে বসার জন্য নিজেকে সাজ-সজ্জিত করে রেখেছিলেন এবং আবু আল সালসাবিল (রা.) তাকে চিনতে পেরেছিলেন বলেই তিনি সাজসজ্জা করতে নিষেধ করেছিলেন। এখানে স্পষ্ট যে সুবাইয়া (রা.) মুখ ঢেকে ছিলেন না। কারণ মুখ ঢাকা থাকলে আবু আল সালসাবিল (রা.) তাকে চিনতে পারার কথা নয়। এ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে রসুল (সা.) জামানায় মেয়েরা মুখে কাপড় দিয়ে পর্দা করতেন না।

৫. রসুল (সা.) বলেন, "যখন তোমাদের কেউ কোনো মেয়েকে বিয়ের প্রস্তাব দেবে, তখন তাকে দেখলে কোনো গুনাহ হবে না। তবে কেবল বিয়ে করার উদ্দেশ্যেই দেখতে হবে, যদিও মেয়ে জানতে না পারে।"[২৭] পাত্রী যদি বিয়ের ব্যাপারে না জানে তাহলে পাত্র কীভাবে তাকে দেখবে? যদি পাত্রী মুখ খোলা রেখেই চলে তবেই দেখা সম্ভব।

ইসলাম মানুষের পরিচয় গোপন রাখতে নিষেধ করে। পালক সন্তানকে তাঁর আসল বাবার নামে পরিচিত করতে হয়, নারীকে তাঁর স্বামীর উপনাম গ্রহণ না করে পৈতৃক নাম ব্যবহার করতে হুকুম দান করে। সে প্রেক্ষিতে ইসলাম নারীকে নিকাবের আড়ালে তার পরিচয় গোপন করতে কেমন করে আদেশ দিতে পারে?

উপরোক্ত হাদিসগুলো থেকে পরিষ্কার জানা যাচ্ছে যে রসুলাল্লাহ (সা.) এর জীবনকালে যেমন নারীদের স্বাধীনতা খর্ব করা হয়নি, তেমনি তাদেরকে অন্তঃপুরবাসিনী করেও রাখা হয়নি। তখন নারীরা যেমন মসজিদে প্রবেশ করতে পারত, ঈদের দিনে ঈদগাহে সমবেত হতে পারত, যুদ্ধেও যেতে

২৬। মুসলিম শরীফ, তালাক অধ্যায়, হাদিস নং- ৩৫৯৩

২৭। মুসনাদ আহমাদ, হাদিস নং- ২৩৬৫০-৫১; সিলসিলা সহীহাহ, হাদিস নং- ৯৭

পারত। এক কথায় নারীরা পুরুষের পাশাপাশি সকল কাজেই অংশগ্রহণ করতে পারত। খেলাফায়ে রাশিদুনের আমলেও নারীরা চেহারা খুলে বাইরে বের হতেন, পুরুষের পাশাপাশি সকল কাজে অংশগ্রহণ করতেন। চেহারা খুলে নারীদের বাইরে বের হওয়ার ব্যাপারে যে নিষেধাজ্ঞা সেটা ইসলাম বিকৃত হয়ে যাওয়ার পরের আবিষ্কার। এমন আরও বহু হাদিস এখানে উল্লেখ করা সম্ভব যা থেকে প্রমাণ হয় ইসলাম নারীদের মুখমণ্ডল ঢেকে রাখার ব্যাপারে এবং সামাজিক জাতীয় সকল অঙ্গনে অবদান রাখার ব্যাপারে বাধা দেয় না বরং উৎসাহিত করে। আশা করি মুক্ত হৃদয়ের যুক্তিবোধসম্পন্ন মানুষদের জন্য এ হাদিসগুলোই যথেষ্ট হবে।

এবার হাদিস ও ইতিহাসের আলোকে দেখা যাক রসুলাল্লাহ (সা.) এর সময় নারীরা সামাজিক কোন কোন কাজে অংশগ্রহণ করেছেন

যুদ্ধক্ষেত্রে নারী

নারী সাহাবিগণ রসুলাল্লাহর সঙ্গে যুদ্ধে যেতেন। তাঁদের মূল কাজই ছিল আহতদের চিকিৎসা করা, তাদেরকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে তুলে আনা, পিপাসার্ত যোদ্ধাদের পানি পান করানো, শহীদদের দাফন করা ইত্যাদি। আনাস (রা.) বলেন, রসুল যখন কোনো যুদ্ধাভিযানে বের হতেন তখন উম্মে সুলাইম ও কতিপয় আনসার মহিলাকে সাথে নিয়ে যেতেন। তারা আহতদেরকে চিকিৎসা করত (মুসলিম)।" উল্লেখ্য রসুলের স্ত্রীগণও যুদ্ধে যেতেন।

উমরের (রা.) খেলাফতকালে একদিন যুদ্ধলব্ধ মালামাল বণ্টনকালে কিছু সংখ্যক চাদর মদিনার মহিলাদের মধ্যে বণ্টন করা হয়। যার মধ্যে থেকে একটি ভালো মানের চাদর অবশিষ্ট থাকে। এক ব্যক্তি বলল, হে আমিরুল মোমেনীন! রসুলাল্লাহ (সা.) এর দৌহিত্রী- আপনার স্ত্রী উম্মে কুলসুমকে এ চাদরটি দেওয়া যেতে পারে। উমর (রা.) বলেন, মদিনাবাসিনী উম্মে সালিত এটি পাওয়ার অগ্রাধিকারিনী। তিনি ওহুদ যুদ্ধের দিন সৈনিকদের মশক ভরে পানি এনে খাইয়েছেন।[২৮] আর উত্তম দোপাট্টাটি উম্মে আম্মারাকে দেওয়া হোক, কারণ আমি উহুদ যুদ্ধের দিন রসুলাল্লাহকে বলতে শুনেছি, আমি ডানে ও বায়ে যেদিকে দৃষ্টিপাত করেছি সেদিকেই আমাকে রক্ষার জন্য উম্মে আম্মারাহকে লড়াই করতে দেখেছি।"[২৯]

আনাস (রা.) বলেন, ওহুদ যুদ্ধের দিন আয়েশা ও উম্মে সুলাইম দ্রুতপদে মশক বহন করে পানি আনছিলেন এবং লোকদের মুখে পানি ঢেলে দিচ্ছিলেন।"[৩০] উম্মে আতিয়া (রা.) বলেন, তিনি রসুলাল্লাহর সাথে সাতটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। তিনি তাবুতে থেকে জিনিসপত্রের তত্ত্বাবধান করতেন এবং খাদ্য প্রস্তুত করতেন।"[৩১]

২৮। বুখারি, হাদিস নং ১৩২৮

২৯। আত তবকাতুল কুবরা

৩০। বোখারী ও মুসলিম

৩১। মুসলিম

এরকম শত শত ঘটনা আছে যা প্রমাণ করে মহানবীর নারী সাহাবিরা সেনাবাহিনীর বিপদসংকুল, চ্যালেঞ্জিং কাজগুলোতে এবং যুদ্ধক্ষেত্রে পুরুষ যোদ্ধাদের পাশাপাশি দুঃসাহসী ভূমিকা রেখেছেন। শুধু তা-ই নয় বহুক্ষেত্রে পুরুষ যোদ্ধারা যখন পিছপা হয়েছেন তখন নারী যোদ্ধারা তলোয়ার, তীর, বল্লম নিয়ে লড়াই করে শত্রুকে পরাস্ত করেছেন। অনেক সময় তারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে মুসলিম বাহিনীর পিছু হটে যাওয়া পুরুষ যোদ্ধাদেরকে তাবুর খুঁটি দিয়ে পিটিয়ে ফের যুদ্ধক্ষেত্রে ফেরত পাঠিয়েছেন। পাশাপাশি তারা রণসঙ্গীত গেয়ে গেয়ে যোদ্ধাদেরকে উজ্জীবিত করেছেন।

উহুদের যুদ্ধে বিশৃঙ্খলাজনিত কারণে যখন মুসলিম যোদ্ধারা ছত্রভঙ্গ হয়ে পিছাতে শুরু করে তখন মদিনা থেকে সাফিয়া (রা.) এগিয়ে এসে এবং লাঠি হাতে দৌড়ে দৌড়ে পলায়নপর যোদ্ধাদের তীব্র ভাষায় তিরস্কার ও ভর্ৎসনা করেছিলেন, এমন কি আঘাতও করেছিলেন যেন তারা আবার যুদ্ধক্ষেত্রে ফিরে যান।

খন্দকের যুদ্ধের সময় আল্লাহর রসুল নারী ও শিশুদেরকে একটি নিরাপদ অবস্থানে রেখেছিলেন। জায়গাটি দূর্গের মতো। সেখানে নারী ও শিশুদের নিয়ে হাসান বিন সাবিত (রা.) অবস্থান করছিলেন। হঠাৎ এক ইহুদি এসে দূর্গের চারদিকে কুমতলবে ঘোরাফেরা করতে থাকে যা দেখে সাফিয়া (রা.) হাসান বিন সাবিতকে (রা.)কে অনুরোধ করেন গুপ্তচর ইহুদিকে খতম করে ফেলার জন্য। তখন হাসান বলেন, "আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করুন, আপনি ভালো করেই জানেন আমার দ্বারা এসব কাজ হয় না। আর আমি যদি এ কাজ করতে পারতাম তাহলে কি আমাকে এখানে রেখে যেত?" তখন সাফিয়া (রা.) নিজেই একটি লাঠি নিয়ে দূর্গের নিচে নেমে যান এবং তার মাথায় আঘাত করে হত্যা করেন। দূর্গে ফিরে হাসানকে (রা.) বলেন নিচে গিয়ে তার পোশাক, বর্ম ইত্যাদি খুলে নিয়ে আসার জন্য। এ ঘটনায় তার সাহসিকতার দৃষ্টান্ত ফুটে উঠে।[৩২]

আবু বকর সিদ্দিক (রা.) এর খেলাফতকালে খালেদ ইবনে ওয়ালিদ (রা.) এর সেনাপতিত্বে যে যুদ্ধগুলো পরিচালিত হয় তার মধ্যে অন্যতম যুদ্ধ হলো- ইয়ারমুকের যুদ্ধ। যে যুদ্ধে পুরুষদের পাশাপাশি মুসলিম নারীরা দুঃসাহসী ভূমিকা রেখেছিলেন যা ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত

৩২। শহীদ আখন্দ অনূদিত প্রথমা প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত ইবনে ইসহাক, পৃষ্ঠা- ৪৯৮

মাওলানা আকবর শাহ খান নজিবাবাদীর লেখা ইসলামের ইতিহাস এর প্রথম খণ্ডের ২৯৫ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হয়েছে।

নারীর এমন চরিত্র একদিনে হয়নি। রসুলাল্লাহ ধীরে ধীরে তাদেরকে সেনাবাহিনীতে যুক্ত করে যুদ্ধ করার উপযুক্ত করে গড়ে তুলেছিলেন। উম্মুল মোমেনীন আয়েশা (রা.) অল্প বয়সে রসুলাল্লাহর সংসারে আসেন। তখন থেকেই রসুলাল্লাহ তাঁকে সর্ববিষয়ে পারদর্শী করে গড়ে তুলতে থাকেন। একদিন রসুলাল্লাহ (সা.) আয়েশার (রা.) সঙ্গে দৌড় প্রতিযোগিতাও করেছিলেন বলে হাদিসগ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে। সেই প্রতিযোগিতায় তিনি ইচ্ছা করে নিজের গতি কমিয়ে আয়েশাকে (রা.) বিজয়ী হওয়ার সুযোগ দেন, যেন আয়েশা (রা.) অনুপ্রাণিত হন, আনন্দিত হন।

চিকিৎসাক্ষেত্রে নারী

রসুলাল্লাহর নারী আসহাব রুফায়দাহ আসলামিয়াহ ছিলেন একজন দক্ষ চিকিৎসক। মসজিদে নববীর মধ্যে যুদ্ধাহত সাহাবিদের চিকিৎসা ও সেবার জন্য একটি হাসপাতালের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। যে হাসপাতালের সার্বিক পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন তিনি। খন্দকের যুদ্ধে আহত সা'দ বিন মা'আজ (রা.) দীর্ঘদিন অসুস্থ অবস্থায় তাঁর অধীনেই চিকিৎসাধীন ছিলেন।[৩৩]

রুবাইয়া বিনতে মুয়ায়েজ (রা.) বর্ণনা করেছেন, তারা রসুলাল্লাহর (সা.) সঙ্গে জেহাদে অংশগ্রহণ করতেন। লোকদেরকে পানি পান করাতেন, তাদের আবশ্যকীয় জিনিসগুলো সরবরাহ করতেন, আহতদের ঔষধপত্রের ব্যবস্থা করতেন এবং নিহতদের লাশ ও আহতদেরকে মদিনায় স্থানান্তরের ব্যবস্থা করতেন।[৩৪]

৩৩। সিরাত ইবনে ইসহাক

৩৪। বুখারি, হাদিস নং ১৩২৯

মসজিদে সালাহ্ আদায়ে নারী

আরব জাতি ছিল ঐক্যহীন। তাদেরকে আল্লাহর তওহীদের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ করাই ছিল রসুলাল্লাহর সামনে বড় চ্যালেঞ্জ। জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করার প্রশিক্ষণ প্রদান করার জন্য কেন্দ্র হিসাবে রসুলাল্লাহ প্রতিষ্ঠা করেন মসজিদে নববী। যেখানে তিনি নারী-পুরুষ নির্বিশেষে জাতির সকল সদস্যের উপস্থিতি নিশ্চিত করেন। এটা প্রতিষ্ঠিত ইতিহাস যে রসুলাল্লাহর যুগের মো'মেন নারীরা পাঁচ ওয়াক্ত সালাহ মসজিদে পুরুষদের সঙ্গে একই জামাতে কায়েম করতেন। এ বিষয়ে শতাধিক হাদিস ও ইতিহাসের বর্ণনা উল্লেখ করা যায়, কিন্তু তাতে পুনরুক্তিই বৃদ্ধি পাবে। যাদের ইসলাম সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞানও আছে তারা এ বিষয়টি অবগত। তথাপি আজকে আমাদের সমাজের মসজিদে কেবল পুরুষদেরকেই দেখা যায়। অনেক মসজিদে এও লেখা থাকে যে, মহিলাদের প্রবেশ নিষেধ। কিন্তু রসুলাল্লাহর যুগ থেকে মসজিদে নববীতে আজও নারী ও পুরুষরা একই জামাতে সালাহ কায়েম করে আসছেন। মক্কার মসজিদুল হারামেও নারী-পুরুষ একত্রে সালাহ করছেন, হজ করছেন। বাংলাদেশের বাইরে অনেক দেশে এখনও এর প্রচলন দেখা যায়। এ দেশেও ইদানিং কিছু মসজিদে নারীদের জন্য আলাদা জায়গা রাখা হচ্ছে, ঈদের জামাতেও ইদানিং নারীদের অংশগ্রহণ আরম্ভ হয়েছে। কিন্তু আলেম নামধারী এক শ্রেণির বিকৃত আকিদা লালনকারী মানুষ নারীদের বহির্গমনকে বা মসজিদে যাতায়াতকে ধর্মের দৃষ্টিকোণ থেকে নেতিবাচকভাবেই দেখছে। আর ধর্মান্ধ মানুষ তাদের বিবেক-বুদ্ধি-বিবেচনাবোধ বন্ধক দিয়ে রেখেছে সেই স্বার্থান্বেষী ধর্মব্যবসায়ী গোষ্ঠীটির কাছে। তাদের কাছে কোর'আনের আয়াত বা রসুলের জীবনী থেকে এ সংক্রান্ত দলিল যতই দেখানো হোক কোনো ফায়দা নেই। ইতিহাস হচ্ছে, পুরুষরা রসুলের ঠিক পেছনে কাতারবদ্ধ হয়ে দাঁড়াতে শুরু করতেন এবং প্রথম কাতারটি পূর্ণ হয়ে গেলে তার পেছনের কাতারে দাঁড়াতেন। অন্যদিকে, নারীরা মসজিদের সর্বশেষ কাতার থেকে দাঁড়াতে শুরু করতেন এবং সর্বশেষ কাতারটি পূর্ণ হয়ে গেলে তার সামনের কাতারে দাঁড়াতেন। আর ছোট ছেলেরা পুরুষ ও নারীদের মাঝখানে কাতারবদ্ধ হয়ে দাঁড়াত।[৩৫]

নারী-পুরুষের কাতারের মাঝখানে কোনো দেওয়াল বা পর্দা ছিল না। বরং পুরুষদের শেষ কাতারের পরেই সরাসরি নারীদের প্রথম কাতার ছিল।

৩৫। সহিহ বুখারি, জানাজা অধ্যায়, ৩/৪৭৯

অনেকগুলো হাদিসে এ বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে। যেমন একজন প্রসিদ্ধ নারী সাহাবি আসমা বিনতে আবু বকর (রা.) বলেন, তাদের মধ্য থেকে রসুলাল্লাহ উঠে দাঁড়ান এবং তাদের উদ্দেশ্য বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি বললেন, আসল ফিতনা হলো যা কোনো মানুষের কবরে ঘটে থাকে। কথাটি বলার পরেই লোকজন আওয়াজ করতে লাগলো। ফলে রসুলের শেষ কথাটি বুঝতে তার সমস্যা হয়েছিল । তারপর লোকেরা নীরব হলে তিনি তার কাছের পুরুষ সাহাবিকে বলেন, "আল্লাহ আপনার মঙ্গল করুন! রসুল (সা.) তাঁর বক্তব্যের শেষে কী বলছিলেন?" পুরুষটি জবাব দিলেন, "রসুলাল্লাহ বললেন, আমার উপর এ মর্মে ওহী অবতীর্ণ হয়েছে, তোমরা কবরে যে ধরনের ফেতনার সম্মুখীন হবে, সেটা দাজ্জালের ফিতনার মতোই।"[৩৬]

এরপর ফাতিমা বিনতে কায়েস (রা.) কর্তৃক বর্ণিত আরেকটি হাদিসের কথা বলা যায়। তিনি বলেন, "জামায়াতে সালাহ কায়েমের উদ্দেশ্যে মানুষদেরকে আহ্বান করা হলো। তাদের সাথে তিনিও সালাহ কায়েম করতে যান। তিনি ছিলেন নারীদের প্রথম কাতারে এবং তার কাতারটি ছিল পুরুষদের কাতারের ঠিক পেছনে। রসুলাল্লাহ সালাত শেষে হাসতে হাসতে মিম্বরে বসলেন এবং বললেন, প্রত্যেকেই নিজ নিজ সালাতের স্থানে বসে থাকো। তারপর বললেন, তোমরা কি জান, আমি কেন তোমাদের সমবেত করেছি? সবাই বললো, আল্লাহ ও তাঁর রসুলই সর্বাধিক অবগত। তিনি বললেন, আল্লাহর শপথ! আমি তোমাদের কোনো উৎসাহব্যঞ্জক বা ভীতিকর খবরের জন্য সমবেত করিনি। বরং এ উদ্দেশ্যে সমবেত করেছি যে, তামীমে দারী নামক এক ব্যক্তি আমার কাছে এসেছে। সে ছিল একজন খ্রিস্টান। সে আমার কাছে এমন একটি ঘটনা বর্ণনা করেছে যা আমি মাসীহে দাজ্জাল সম্পর্কে তোমাদের ইতোপূর্বে যে কথা বলেছিলাম তার সাথে হুবহু মিলে যায়।"[৩৭]

এ ঘটনাগুলো কী প্রমাণ করে? এটাই প্রমাণ করে যে, রসুলের যুগে নারী-পুরুষ একত্রে মসজিদে সালাহ কায়েম করতেন। সালাতের সময় বা আলোচনার সময় তাদের মধ্যে কোনো পর্দা টাঙানো থাকত না। কাতার সরকারের ধর্ম মন্ত্রণালয়ে ইমাম ও খতিব পদে নিয়োগ পেয়ে ১৯৯৬ সন থেকে প্রায় ২৩ বছর ধরে সেদেশে আছেন ইউসুফ নূর নামে একজন প্রবাসী বাঙালি।

৩৬। বুখারি, নাসায়ী ৭/২০০

৩৭। সহিহ মুসলিম, ফিতনা অধ্যায়, ৮/২০৫

দায়িত্বপালন করছেন সরকারের একাধিক ধর্মীয় পদেও। তার একটি সাক্ষাৎকার দৈনিক যুগান্তরে প্রকাশিত হয় ২০ অক্টোবর ২০১৭ তারিখে। বাংলাদেশের মসজিদগুলোয় নারীদের জন্য নামাজের তেমন কোনো ব্যবস্থা নেই, এ প্রসঙ্গটি উল্লেখ করে তার মতামত জানতে চাওয়া হয়। তিনি বলেন, মিসরের একজন শিক্ষাবিদ ড. সাইয়্যেদ আস সাফতি, যিনি বাংলাদেশের দারুল ইহসান ইউনিভার্সিটির শিক্ষক ছিলেন, তিনি কাতারের এক পত্রিকায় সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন- 'বাংলাদেশের মেয়েরা সিনেমা হলে যেতে পারে, মার্কেট, শপিংমল, স্কুল-কলেজ, হাটবাজার এমনকি তারা পার্লামেন্টেও গেছেন কিন্তু তাদের শুধু মসজিদ বা দীনি প্রতিষ্ঠানগুলোতে যাওয়ার অধিকার নেই!' বেচারা দুঃখ করে বলেছিলেন, 'তারা কোনো কোনো মসজিদে মেয়েদের ঢোকার ব্যবস্থা করেছিলেন কিন্তু আলেমরা এমনভাবে বাধা দিয়েছেন যেন তারা কবিরা গুনাহ করে ফেলেছেন। অথচ তারাই মক্কা-মদিনাতে তাদের স্ত্রী, মেয়েদের নিয়ে এক ইমামের পেছনে নামাজ পড়ছেন!' তিনি প্রশ্ন রেখেছিলেন, 'মক্কা-মদিনার মসজিদে যেটা জায়েজ বাংলাদেশে সেটা কেন নিষেধ হবে।" নারীদের মসজিদে যাওয়ার, রাত্রিতেও অনুমতি দেওয়া হয়েছে:

"আবদুল্লাহ ইবনে উমর থেকে বর্ণিত, তিনি রসুলকে বলতে শুনেছেন, তোমাদের স্ত্রীরা মসজিদে যাওয়ার অনুমতি চাইলে তাদেরকে মসজিদে যেতে বাধা দিও না।"[৩৮] অনত্র বর্ণনায় এসেছে, তোমাদের স্ত্রীরা রাতের বেলা মসজিদে যাওয়ার অনুমতি চাইলে তাদেরকে অনুমতি দাও।"[৩৯]

৩৮। মুসলিম

৩৯। বুখারি ও মুসলিম

জুমার দিনে রসুলাল্লাহর কাছ থেকে নারীদের শিক্ষাগ্রহণ

সরাসরি কারো কাছ থেকে কিছু শুনলে তাতে ভালোভাবে মনোযোগ প্রদান ও তা থেকে যথাযথভাবে শিক্ষাগ্রহণ করা সহজ হয়। রসুলুল্লাহ (সা.) বক্তব্য দেওয়ার সময় নারীরা তাঁর সম্মুখেই বসে থাকতেন, তাঁদের মাঝখানে কোনো কালো পর্দা ঝোলানো থাকত না। এমনও হয়েছে, কোনো কোনো নারী রসুলের (সা.) কাছ থেকে সরাসরি তেলাওয়াত শুনে কোর'আনের অনেক আয়াত মুখস্থ করে ফেলেছেন। উম্মে হিশাম বিনতে হারেসা বিন নোমান (রা.) বলেন, রসুল (সা.) প্রত্যেক জুমায় তাঁর বক্তব্যে সুরা কাফ তেলাওয়াত করতেন। তিনি কেবল তাঁর নিকট থেকে শুনেই সুরাটি মুখস্থ করে ফেলেছিলে। [৪০]

ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আরেকটি হাদিস বুখারি ও মুসলিম শরিফে রয়েছে। তিনি বলেন, উম্মুল ফজল বিনতে হারেস (রা.) আমার কাছ থেকে সুরা মুরসালাত পাঠ করতে শুনেছিলেন। উম্মুল ফজল মন্তব্য করলেন, হে বৎস আমার! তোমার তেলাওয়াত আমাকে মনে করিয়ে দিল, আল্লাহর রসুলের (সা.) নিকট থেকে আমার শোনা এটাই হচ্ছে সর্বশেষ সুরা। মাগরিবের নামাজে তিনি এটি তেলাওয়াত করেছিলেন।[৪১]

নফল সালাতে রসুলের সঙ্গে নারী

আসমা বিনতে আবু বকর (রা.) থেকে আরেকটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, রসুলুল্লাহর (স.) জীবদ্দশায় একবার সূর্যগ্রহণ হয়েছিল। তারপর তিনি এসে মসজিদে প্রবেশ করে দেখতে পেলেন, রসুলুল্লাহ (সা.) নামাজে দাঁড়িয়ে আছেন। তখন তিনিও তাঁর সাথে দাঁড়িয়ে নামাজে শামিল হন। তিনি এত দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকলেন যে তার বসে যেতে ইচ্ছা করছিল। এমন সময় তিনি খেয়াল করেন, একজন দুর্বল মহিলাও তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। তখন তিনি বললেন, এ মহিলা তো তার চেয়েও দুর্বল। এ দেখে তিনিও দাঁড়িয়ে থাকলেন। এরপর রসুলুল্লাহ (সা.) রুকু করলেন। রুকুতে তিনি দীর্ঘ সময় থাকলেন। তারপর মাথা উঠিয়ে এমনভাবে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে

৪০। সহিহ মুসলিম, জুম'আ অধ্যায়, ৩/১৩

৪১। সহিহ বুখারি, আজান অধ্যায়, ২/৩৮৮। সহিহ মুসলিম, সালাত অধ্যায়, ২/৪০

রইলেন যে, বাইরে থেকে তখন কেউ আসলে তার কাছে মনে হবে, তিনি বুঝি রুকুই করেননি।[৪২]

আলোচনাসভায় রসুলের সঙ্গে নারীদের কথোপকথন

একদিন রসুলাল্লাহ সাহাবিদের সঙ্গে মসজিদে নববীতে বসে আছেন। সেখানে উপস্থিত হলেন নারী সাহাবি ফাতেমা বিনতে উতবা (রা.)! তিনি বিনয়ের সাথে আরয করলেন- "ইয়া রসুলাল্লাহ! একটা সময় ছিল যখন আমি কামনা করতাম দুনিয়ার মধ্যে যদি কেবল আপনার ঘরটাই ধ্বংস হয়ে যেত আর সবই থাকত ঠিকঠাক। আর আজ আপনার প্রতি আমার ভালোবাসা এমন- আমার মন বলে এই পৃথিবীতে আর কারও ঠিকানা থ াকুক আর না থাকুক, আপনারটা যেন অটুট থাকে।" এ কথা শোনার পর রসুল (সা.) বললেন: "দেখ, যতক্ষণ পর্যন্ত আমাকে তোমার নিজের সত্তার চাইতেও অধিক ভালো না বাসবে ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি মো'মেনই হতে পারবে না।" ফাতিমা (রা.) বললেন, "হে রসুল (সা.)! আপনি আমার কাছে আমার জীবনের চাইতেও অধিক প্রিয়!"

এ হাদিসটি লক্ষ করুন, "আবু সাঈদ খুদরী থেকে বর্ণিত, এক মহিলা রসুলের কাছে এসে বললো, হে আল্লাহর রসুল! আপনার বক্তব্য শোনার সুযোগ শুধু পুরুষরাই লাভ করছে। তাই আপনার পক্ষ থেকে শুধু আমাদের জন্য একটি দিন নির্দিষ্ট করে দিন। তিনি বলেন, অমুক অমুক দিনে তোমরা সমবেত হও। তারা সমবেত হলে তিনি তাদের কাছে গেলেন।"[৪৩] এখানেও লক্ষণীয় যে, মসজিদে রসুলাল্লাহর আলোচনা চলাকালে নারী-পুরুষ উভয়েরই অবাধ যাতায়াত ছিল এবং নারীদেরকে সেখানে বিচ্ছিন্ন করে রাখার কোনো পদ্ধতি ছিল না।

বর্তমানে নারীদের মসজিদে যাওয়ার কথা শুনলেই এক শ্রেণির মানুষ তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠেন। তাদের যুক্তি হলো, নারীরা মসজিদে গেলে তারা নাকি অমনোযোগী হয়ে পড়বেন, ফলে সালাত কায়েম করতে পারবেন না। তাছাড়া পরবর্তী যুগের আলেমরা নাকি ইজমা কিয়াস করে রসুলের সময়ের

৪২। সহিহ মুসলিম, সূর্যগ্রহণ অধ্যায়, ৩/৩২

৪৩। বুখারি ও মুসলিম

এ নিয়মকে পাল্টে দিয়েছেন। তাদের যুক্তি হচ্ছে, এখন ফেতনার যুগ। এখন নারী-পুরুষের চরিত্র সাহাবায়ে আজমাইনদের মতো পুত-পবিত্র নেই। তাই মেয়েদেরকে উত্যক্ত করা হবে, মসজিদে মেয়েরা গেলে মসজিদের পবিত্রতা বিনষ্ট হবে। এ বিষয়ে বুখারির ৮৫৪ নম্বর হাদিসটি উল্লেখ করা যেতে পারে। আব্দুল্লাহ বিন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত: উমর (রা.)-এর এক স্ত্রী ছিলেন। তাঁর নাম ছিল আতিকা। তিনি ফজর এবং ইশার নামাজে মসজিদের জামাতে হাজির হতেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো, আপনি কেন মসজিদে যান? যখন আপনি জানেন যে, উমর (রা.) এটা অপছন্দ করেন এবং আত্মমর্যাদাহানিকর মনে করেন। তিনি বললেন: আমাকে নিষেধ করে দিতে উমরকে (রা.) কীসে বারণ করেছিল? "আল্লাহর বান্দীদেরকে আল্লাহর মসজিদ যেতে বাধা দিও না" নিশ্চয়ই রসুলাল্লাহর এই বাণী তাকে বাধা দিয়েছিল।

উমর (রা.) ব্যক্তিগতভাবে রাতের সালাতে নারীদেরকে বিশেষ করে উম্মুল মোমেনীনদের মসজিদে যেতে বারণ করেছিলেন কারণ পথে তাদেরকে উত্যক্ত করার দু-একটি ঘটনা ঘটেছিল। কিন্তু তাঁর নিজের স্ত্রী আতিকা (রা.) খলিফার এ নিষেধাজ্ঞাকে মেনে নেননি, কারণ যে সুন্নাহ বা রীতি রসুল নিজে প্রতিষ্ঠা করে গেছেন সেটাকেই তিনি ইসলামের আদর্শ বিধান বলে মান্য করেছেন। রাস্তায় যদি মেয়েদেরকে উত্যক্ত করা হয় সেক্ষেত্রে মো'মেনদের করণীয় হচ্ছে রাস্তাকে নিরাপদ করা। রাস্তা নিরাপদ না করে মেয়েদেরকে বের হতে না দেওয়ার অর্থ তো অন্যায়ের কাছে নতি স্বীকার করে নেওয়া। আমাদেরকে দেখতে হবে প্রকৃতপক্ষে ইসলামের চাওয়া কোনটি। সেটা আমরা পাবো কোর'আনে ও রসুলাল্লাহর জীবনীতে। এবার দেখা প্রয়োজন এ বিষয় কোর'আন কী বলে। সুরা আরাফের ৩১ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেন, "হে আদম সন্তানেরা! তোমরা সালাতের উদ্দেশ্যে মসজিদে যাওয়ার সময় উত্তম পোশাক পরিধান কর।"

এখানে আল্লাহ কেবল পুরুষদেরকে মসজিদে যেতে বলেননি, সম্বোধন করেছেন - 'হে আদমসন্তান', যার মধ্যে নারী পুরুষ উভয় পড়ে। সুতরাং এ হুকুম স্বয়ং আল্লাহর, কোনো মানুষের এ বিষয়ে ভিন্ন হুকুম দেওয়ার কোনো এখতিয়ারই নেই। প্রয়োজনে সমাজব্যবস্থা পাল্টাতে হবে এবং সমাজকাঠামোকে আল্লাহর হুকুম মান্য করার অনুকূলরূপে সাজাতে হবে। ঘুঁনে ধরা বিকৃত প্রথাকে ধর্মের বাতাবরণ দিয়ে সেটাকে আল্লাহ রসুলের নাম

দিয়ে চালিয়ে যাবার সুযোগ নেই। অথবা একটি ব্যবস্থা আল্লাহর রসুলের সময়ে কায়েম হয়েছে, এখন পরিবর্তিত সময়ে সেটা আবার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয় বলে এড়িয়ে যাওয়ারও সুযোগ নেই। কারণ ইসলাম একটি চিরন্তন জীবনব্যবস্থা।

মসজিদে নববী পরিচ্ছন্নতায় নারী

অনেকে জানে না যে, রসুলাল্লাহর সময় মসজিদে নববী ঝাড়ু দিতেন একজন মহিলা সাহাবি উম্মে মাহজান (রা.)। তিনি যেদিন মারা যান সেদিন রসুলাল্লাহর সাহাবিরা নিজেদের উদ্যোগে তাঁর জানাজা ও দাফন কার্য সম্পাদন করেন। তাঁর মৃত্যুসংবাদ রসুলাল্লাহকে তাৎক্ষণিক জানানো হয় না বিভিন্ন কারণে। কিন্তু তিনি যখন সংবাদটি শোনেন তখন খুব আফসোস করেন এবং বলেন, 'তোমরা যদি আমাকে খবরটি দিতে'।[৪৪]

জানাজার সালাতে নারীদের অংশগ্রহণ

প্রচলিত ইসলামের ধ্যান-ধারণা মোতাবেক নারীদের কারো জানাজায় অংশগ্রহণের অনুমতি নেই, এমনকি স্বামী সন্তানের জানাজাতেও না, নারীদের জানাজাতেও না। কিন্তু প্রকৃত ইসলামের ইতিহাস অন্য কথা বলে। রসুলাল্লাহর ঘনিষ্ঠ সাহাবি সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.) যখন এন্তেকাল করেন তখন রসুলাল্লাহর স্ত্রীগণ তাঁর জানাজায় অংশগ্রহণের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং তাঁর মৃতদেহ মসজিদে নিয়ে আসার জন্য বলেন। তাঁদের কথা মোতাবেক সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাসের (রা.) দেহ মসজিদে নববীর অভ্যন্তরে নিয়ে আসা হয়। তখন তাঁর জানাজার সালাতে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে বহু সাহাবি অংশগ্রহণ করেন। রসুলাল্লাহর স্ত্রীগণও তাতে অংশগ্রহণ করেন। এ হাদিসটি সহিহ মুসলিম শরীফের জানাজা অধ্যায়ের মসজিদে জানাজা পড়া অনুচ্ছেদের (৩য় খণ্ড) ৬৩ পৃষ্ঠায় রয়েছে।

এ ঘটনাটি থেকে এটা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, নারীদেরকে জানাজায় অংশগ্রহণে

৪৪। বুখারি, সালাত অধ্যায়, হা/৪৫৮; মুসলিম, 'জানাজা' অধ্যায়, হা/৯৫৬

নিষেধাজ্ঞা আরোপ করার সিদ্ধান্তটি ইসলামের নয়, এ ধ্যান ধারণার জন্ম হয় বহু পরে যখন পর্দাপ্রথার নামে নারীদেরকে পেছনে ফেলে রাখার নানা মাসলা-মাসায়েল আবিষ্কার করা হয় তখন। যে মিথ্যা বানোয়াট মাসলা-মাসায়েলের জালে আটকা পড়ে আছে আজকে নারীরা।

সংস্কৃতি চর্চায় নারী

সঙ্গীত সর্বযুগে সর্বজাতির সংস্কৃতির অঙ্গ। আরবরাও এর বাইরে নয়। কিন্তু ইসলামপূর্ব আরবের সংস্কৃতিতে অনেকভাবে অশ্লীলতার অনুপ্রবেশ ঘটেছিল। রসুল সেই সংস্কৃতি থেকে অশ্লীলতা পাপাচারকে বিদূরিত করেন। আগেও গায়িকারা গান করত, সঙ্গে অশ্লীল নৃত্য ছিল অনুষঙ্গ। অর্থের বিনিময়ে তারা নাচগানের পাশাপাশি দেহব্যবসাও করত। কিন্তু ইসলাম অশ্লীলতাকে হারাম করেছে। সুতরাং সাংস্কৃতিক অঙ্গনসহ সমাজের সর্ব অঙ্গন থেকেই যাবতীয় অশ্লীলতা দূর করা হলো। রসুলের সময়ও মদীনায় বিয়ে শাদি বা কোনো দিবসকেন্দ্রিক উৎসবে গান হত। তখন তো আজকের মতো এত বাদ্যযন্ত্র ছিল না, কেবল দফ, তাম্বুরা জাতীয় বাদ্যযন্ত্র ছিল। সেটা বাজিয়েই তারা অনুষ্ঠান করতেন। একটি বাদ্যযন্ত্র বৈধ হওয়ার অর্থ যে কোনো বাদ্যযন্ত্রই বৈধ।

জাহেলিয়াতের যুগে আরবে গান আর অশ্লীলতা ছিল একই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ। তাই অনেক সাহাবি গানকেও ফাহেশা কাজ বা মন্দ কাজ ভাবতেন। কিন্তু রসুলাল্লাহ তাঁদের এ ভুল ধারণা ভাঙিয়ে দেন। তিনি সত্য-মিথ্যা, ন্যায়-অন্যায়ের সূক্ষ্ম ব্যবচ্ছেদ করলেন দক্ষ শল্যবিদের মতো। সঙ্গীতাঙ্গন থেকে বাদ দিলেন অশ্লীলতা, মিথ্যাচার ও আল্লাহর নাফরমানির অংশটুকু আর রেখে দিলেন সঙ্গীত, বাদ্য ও নির্মল বিনোদন। একটি ঘটনা এখানে প্রাসঙ্গিক।

রসুলাল্লাহর নারী সাহাবি রুবাই বিনতে মুআব্বিয ইবনু আফরা (রা.) বলেন, "আমার বাসর রাতের পরদিন নবী (সা.) এলেন এবং আমার বিছানার ওপর বসলেন, যেমন বর্তমানে তুমি আমার কাছে বসে আছ। সে সময়ে মেয়েরা দফ বাজাচ্ছিল এবং বদর যুদ্ধে শাহাদাতপ্রাপ্ত আমার বাপ-চাচাদের

শোকগাঁথা গাচ্ছিল। তাদের একজন গাচ্ছিল, আমাদের মধ্যে এক নবী আছেন, যিনি ভবিষ্যৎ জানেন। তখন রসুলুল্লাহ্ বললেন, এ কথাটি বাদ দাও, আগে যা গাইছিলে তাই গাও।"[৪৫] এখানে রসুলাল্লাহ মেয়েদেরকে গান গাইতে বারণ করলেন না, কিন্তু তাঁর ব্যাপারে একটি মিথ্যা ধারণা তিনি সংশোধন করে দিলেন। অর্থাৎ সঙ্গীত চলবে কিন্তু সঙ্গীতের কথায় মিথ্যার মিশ্রণও থাকা চলবে না।

রসুলাল্লাহ গান নিষিদ্ধ করেননি, কারণ তিনি জানতেন মানুষের আত্মা আছে, সে পশু নয়। তার চিত্তবিনোদনের প্রয়োজন আছে। এটা বন্ধ করলে অপ্রাকৃতিক হবে। কিন্তু মানব ইতিহাসের ব্যস্ততম পুরুষ, যিনি মাত্র ৯ বছরে ১০৭ টি ছোট বড় যুদ্ধাভিযানের আয়োজন করেছেন, যিনি মানবজীবনের সর্ব অঙ্গনের আমূল পরিবর্তন সাধনের জন্য এক মহান বিপ্লব সম্পাদন করেছেন, এমন এক মহাবিপ্লবী যোদ্ধানবীর গান নিয়ে পড়ে থাকার অবসর ছিল না। তবু অবসরে নিজ গৃহে অথবা যুদ্ধ থেকে ফিরে সাহাবিদের সঙ্গে তাঁকে গান শুনতে দেখা গেছে এমন হাদিস আমরা যথেষ্ট পরিমাণেই পাই।

আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত একটি হাদিস থেকে জানা যায়, একবার রসুলাল্লাহ কোনো এক সফরে যাচ্ছিলেন। জনৈক উট চালক উটের রশি ধরে হেঁটে যাচ্ছিল আর গান গাচ্ছিল। গান গেয়ে সে উটকে জোরে চলার জন্য অনুপ্রাণিত করছিল। এ গানগুলোকে বলা হয় হুদী সঙ্গীত। উটের পিঠে আরোহী ছিলেন রসুলাল্লাহর স্ত্রীগণ। স্ত্রীগণের উটটি রসুলাল্লাহর উটকে অতিক্রম করে যাচ্ছিল। তখন তিনি গায়ককে লক্ষ্য করে বললেন, আনযাশাহ! সাবধানে চলো; এ কাচের পাত্রদের সঙ্গে কোমল আচরণ করো।[৪৬] অর্থাৎ রসুলাল্লাহ একদিকে যেমন নারীদেরকে সর্ব অঙ্গনে কাজ করার যোগ্য করে গড়ে তুলেছেন অপরদিকে নারীর সৃষ্টিগতভাবে পুরুষের তুলনায় দুর্বলতর শারীরিক কাঠামোর কথাও তিনি বিস্মৃত হননি।

সঙ্গীত চিরন্তন ও শ্বাশ্বত বিনোদনের মাধ্যম, তাই আরবের নারী-পুরুষ উভয়কেই সঙ্গীতচর্চা করতে দেখা গেছে। রসুলাল্লাহ যখন হেজরত করে মদিনায় এসে পৌঁছান তখন তাঁকে বরণ করে নেওয়ার জন্য আনসারগণ "তালা-আল বাদরু আলাইনা" গানটি গাইতে থাকেন। এ গানটি চৌদ্দশ

৪৫। সহিহ বোখারী, হাদিস নং ৫১৪৭

৪৬। মুসনাদে আহমদ, ৩:১৭২, ১৮৭, ২০২

বছরেরও বেশি পুরনো ইসলামি সংস্কৃতির একটি অনন্য নিদর্শন যা আজও গীত হয়।

আল্লাহ কোর'আনে কোথাও গান ও বাদ্যযন্ত্র নিষিদ্ধ করেননি, আল্লাহর রসুলও গানবাদ্য হারাম এমন কথা বলেননি। এগুলো হারাম করেছেন এক শ্রেণির অতি-বিশ্লেষণকারী পণ্ডিত। রসুলাল্লাহর জীবনে এমন অনেক ঘটনা আছে যে তিনি গান শুনেছেন। আম্মা আয়েশা (রা.) খুব সংগীতানুরাগী ছিলেন। তাঁর গৃহে রসুলাল্লাহর (সা.) উপস্থিতিতেই সংগীত চর্চার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় হাদিস গ্রন্থগুলিতে। নারী সাহাবিদের সঙ্গীতচর্চা নিয়ে তিনটি হাদিস উল্লেখ করা হলো-

(ক) একবার আরবের একটি জাতীয় উৎসবের দিন 'বুয়াস দিবস'- এ দুটো মেয়ে রসুলাল্লাহর ঘরে দফ ও তাম্বুরা বাজিয়ে গান গাইছিল। আম্মা আয়েশাও (রা.) গান শুনছিলেন। এমন সময় তাঁর পিতা আবু বকর (রা.) সেখানে আসেন এবং আম্মা আয়েশাকে (রা.) তিরস্কার করেন। তখন আল্লাহর নবী আবু বকরের (রা.) দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আবু বকর! তাদেরকে তাদের কাজ করতে দাও।"[৪৭]

(খ) আয়েশা (রা.) একটি মেয়েকে লালন পালন করতেন। অতঃপর তাকে এক আনসারের সাথে বিয়ে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানস্থল থেকে আয়েশা (রা.) এর প্রত্যাবর্তনের পর রসুলাল্লাহ (সা.) জিজ্ঞেস করলেন,"তুমি কি মেয়েটিকে তার স্বামী গৃহে রেখে এসেছো?" উত্তরে তিনি বললেন, "হ্যাঁ"। পুনরায় রসুল (সা.) জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কি এমন কাউকে তাদের বাড়ি পাঠিয়েছ যে গান গাইতে পারে?" আয়েশা (রা.) বললেন, "না"। রসুলাল্লাহ বললেন, "তুমি তো জান আনসাররা অত্যন্ত সংগীতপ্রিয়।"[৪৮]

(গ) আবু বোরায়দা (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, মহানবী (সা.) কোনো একটি যুদ্ধ থেকে ফিরে আসার সময় একজন কৃষ্ণাঙ্গ নারী আসহাব মহানবী (স.) এর সামনে এসে বললেন যে- 'ইয়া রসুলুল্লাহ, আমি মানত করেছিলাম যে, আপনাকে নিরাপদে আল্লাহ ফিরিয়ে আনলে আমি

৪৭। সহিহ বোখারী, হাদিস নং ৯৮৭

৪৮। ইকদ আল ফরিদ

আপনার সামনে দফ বাজিয়ে গান গাইব।' মহানবী (স.) বললেন, 'যদি তুমি মানত করে থাক তাহলে বাজাও। মানত পূর্ণ কর। তারপর মেয়েটি দফ বাজিয়ে গান গাইতে লাগে।'[৪৯]

এ ঘটনাগুলোতে কয়েকটি বিষয় ভাল করে লক্ষ করে দেখুন:

১. যে ঘরে গান হচ্ছে সেটি স্বয়ং রসুলাল্লাহর ঘর

২. ঘরে তিনি স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন

৩. তাঁর স্ত্রী আয়েশা (রা.) সংগীত অনুরাগী ছিলেন

৪. মেয়েগুলো বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে গান করছিল

৫. উৎসবের সাথে সম্পর্কিত গান, তা কোনো ইসলামিক গজল ছিল না

৬. বুয়াস দিবস অর্থাৎ আরবের কোনো জাতীয় দিবস। সেটাও ইসলামিক কোনো অনুষ্ঠান ছিল না।

উপরোক্ত কোনো ঘটনাতেই স্বয়ং আল্লাহর রসুল (সা.) সংগীত ও বাদ্যযন্ত্রকে নিষিদ্ধ বা হারাম ঘোষণা করেননি। বরং আবু বকরের (রা.) ঘোর আপত্তি সত্ত্বেও রসুল (সা.) তাদেরকে গান চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দিয়ে থাকেন। তাহলে সংগীতকে হারাম করল কারা? ইসলাম সুর-সংগীতকে কখনই নিষিদ্ধ করার পক্ষপাতী নয়। নিষিদ্ধ করেছে অশ্লীলতা, নোংরামি, অন্যের ক্ষতি হয়, আল্লাহর নাফরমানি করা হয় এমন বিষয়কে। অশ্লীলতা নিশ্চয়ই কোনো ধর্মই সমর্থন করে না।

৪৯। তিরমিজি ২য় খণ্ডের ২০৯-২১০ পৃষ্ঠা, মেশকাত শরিফের ৫৫৫ পৃষ্ঠা ও আবু দাউদ শরিফ

শরয়ী ওজর থাকলেও জুমা ও ঈদে নারীদেরকে উপস্থিত থাকার আদেশ

জুমা একটি সাপ্তাহিক সম্মেলন যেখানে সালাতের পাশাপাশি এলাকার বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা হবে, সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে, অপরাধীদের দণ্ড দেওয়া হবে এবং জাতির প্রধান (এমাম) এর পক্ষ থেকে নির্দেশ পাঠ করা হবে। এ বক্তব্যই হচ্ছে খোতবা। ঈদও এমনই একটি সম্মেলন। তাই জুমা ও ঈদে জাতির প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক সক্ষম নারী পুরুষের উপস্থিত থাকা আবশ্যক। নারীদেরকে ঋতুকালীন সময়ে সালাত থেকে আল্লাহ অব্যাহতি দিয়েছেন কিন্তু জুমা ও ঈদের সমাবেশে থেকে খোতবা শোনা থেকে তাদেরকে অব্যাহতি দেওয়া হয়নি। উম্মে আতিয়া (রা.) এ প্রসঙ্গে বলেন, "আমাদেরকে রসুলাল্লাহ (দ.) আদেশ করতেন আমরা যেন মহিলাদেরকে ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহাতে সালাতের জন্য বের করে দেই; পরিণত বয়স্কা, ঋতুবতী ও গৃহবাসিনীসহ সকলকেই। তারা লোকদের পেছনে থাকত। লোকেরা তাকবির বললে তারাও তাকবির বলত এবং তাদের সাথে দোয়ায় শরীক হতো। এভাবে সবাই ঐ দিনের কল্যাণ ও পবিত্রতা লাভের আশা করত। একজন নারী রসুলাল্লাহকে জিজ্ঞাসা করেন যে, হে আল্লাহর রসুল! আমাদের মাঝে কারো কারো ওড়না নেই যা পরিধান করে আমরা ঈদের সালাতে যেতে পারি। রসুলাল্লাহ (দ.) বললেন, সে তার অন্য বোন থেকে ওড়না নিয়ে পরিধান করবে।[৫০] সুতরাং এটা সুস্পষ্ট যে আল্লাহর রসুল নারীদেরকে জাতীয় জীবনের কার্যক্ষেত্রে সম্পৃক্ত থাকতে নির্দেশ, প্রেরণা ও উৎসাহ প্রদান করেছেন। বোরকা দূরে থাক ওড়নাও নেই- এমন ওজরও রসুল গ্রহণ করেননি।

পরামর্শদানে নারী

মিসওয়ার ইবনে মাখরামা ও মারওয়ান থেকে বর্ণিত ঘটনাটি হচ্ছে এমন- হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় রসুল (স.) মক্কার কোরায়েশদের প্রতিনিধি সুহাইল ইবনে আমর নবীকে (স.) বললেন, আপনি আমাদের ও আপনাদের মধ্যে একটি চুক্তিপত্র লেখার ব্যবস্থা করুন। আল্লাহর রসুল লেখক ডেকে বললেন,

৫০। বুখারি ও মুসলিম

লেখ। চুক্তিপত্র লেখা শেষ করে রসুলাল্লাহ তাঁর সাহাবাদের বললেন, 'এখন গিয়ে কোরবানি করো ও মাথা কামিয়ে ফেল।' অর্থাৎ এ বছর আর আমরা হজে যাচ্ছি না। এখানেই হজের আনুষ্ঠানিকতা সমাপ্ত করে ফেল। বর্ণনাকারী বলেন, 'আল্লাহর শপথ! তাদের মধ্যে একজনও উঠল না। রসুলাল্লাহ তিনবার বললেন। কিন্তু একজনও যখন উঠল না। প্রকৃতপক্ষে সাহাবিরা হজ না করে ফিরে যাওয়াকে অপমানজনক পরাজয় হিসাবে গণ্য করছিলেন। তাই রসুলের এ হুকুমকে তাঁরা তাৎক্ষণিকভাবে মেনে নিতে পারছিলেন না। তখন রসুলাল্লাহ তাঁদের সঙ্গ ত্যাগ করে নিজ তাবুতে প্রবেশ করেন। সেখানে তাঁর স্ত্রী উম্মে সালামা (রা.) উপস্থিত ছিলেন। তিনি পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত ছিলেন। তখন তিনি রসুলাল্লাহকে পরামর্শ দিলেন যে, "হে আল্লাহর নবী! আপনি কি আমার পরামর্শ পছন্দ করবেন? আপনি নিজে মাথা মুণ্ডনকারীকে ডেকে মাথা মুণ্ডন করিয়ে নিন, কিন্তু কারো সাথে একটা কথাও বলবেন না।" একথা শুনে রসুলাল্লাহ কারো সাথে কোনো কথা না বলে কাজ সম্পন্ন করলেন। তিনি আজকের দিনের স্বামীদের মতো বললেন না যে, "চুপ থাক। তুমি এসবের কী বোঝো?" তিনি স্ত্রীর পরামর্শ গ্রহণ করে দুম্বা কোরবানি করলেন এবং মাথামুণ্ডনকারীকে ডেকে মাথা মুণ্ডন করালেন। সবাই যখন তা দেখল তারাও উঠে কোরবানি করল ও একজন আরেকজনের মাথা মুণ্ডন শুরু করল।[৫১] কি অসাধারণ যুক্তি ও বুদ্ধি! একদিকে সাহাবিদের জোর করাও হলো না, অন্যদিকে কাজটিও হয়ে গেল। কাজেই জাতীয় জীবন পরিচালনার ক্ষেত্রে নারীদেরকেও রসুলাল্লাহ সম্পৃক্ত করেছেন এবং বহুক্ষেত্রে নারীরা এমন মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে জাতিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন।

৫১। বোখারী

নারীদের বায়াত অনুষ্ঠান হতো সরাসরি, মাঝখানে কোনো পর্দা টাঙানো থাকত না

তাবারির ভাষ্যমতে, মক্কাবিজয়ের পর রসুলাল্লাহ (সা.) এর প্রতি আনুগত্য স্বীকারের জন্য জনগণ একত্র হলো মক্কায়। আমি (তাবারি) শুনেছি, তাদের জন্য তিনি (রসুলাল্লাহ) আল-সাফায় আসন গ্রহণ করেছিলেন, তাঁর নিচে বসে উমর (রা.) রসুলের (সা.) কাছে আনুগত্য স্বীকার করতে আসা মানুষের ওপর শর্ত আরোপ করেছিলেন এবং তাদের সাধ্যমতো আল্লাহ ও রসুলকে (সা.) মান্য করবে ও তাঁদের কথা শুনবে এ প্রতিশ্রুতি আদায় করছিলেন। এ ব্যবস্থা ছিল পুরুষদের জন্য। তাদের শেষ করার পর এল নারীদের পালা। কোরাইশদের হিন্দা বিনতে উতবা এল কাপড়ে মুখ ঢেকে। ছদ্মবেশের কারণ তার কীর্তিকলাপ, বিশেষ করে হামজার (রা.) প্রতি তার আচরণের জন্য তার মনে বড় ভয় ছিল যে রসুল (সা.) তাকে শাস্তি দেবেন। আমি শুনেছি, ওরা তার সামনে এল তিনি জিজ্ঞেস করলেন তারা এই ওয়াদা করছে কি না যে আল্লাহর সঙ্গে কোনো কিছুর শরিক করবে না।

হিন্দা বলেছিল, 'আল্লাহর কসম, পুরুষদের ওপর যা চাপাননি তা আমাদের ওপর চাপাচ্ছেন। আমরা অবশ্য তা প্রতিপালন করব।'

তিনি বললেন, 'আপনি চুরি করবেন না।'

সে বলল, 'আল্লাহর কসম, আবু সুফিয়ানের সামান্য টাকা আমি এদিক-ওদিক করেছি। জানি না সে কাজ আমার জন্য জায়েজ হয়েছে কি না।'

আবু সুফিয়ান ওখানে হাজির ছিলেন। বললেন, অতীতে যা হয়েছে তা সিদ্ধ।

রসুল (সা.) বললেন, 'ও, তাহলে আপনি হিন্দা ইবনে উতবা?'

সে বলল, 'আমি সে-ই। অতীতে যা হয়েছে তার জন্য আমাকে ক্ষমা করুন, আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করবেন।'

তিনি বললেন, 'ব্যভিচার করবেন না।'

সে বলল, ' কোনো স্বাধীন নারী কি ব্যভিচার করে, হে রসুলাল্লাহ (সা.)?'

তিনি বললেন, 'আর আপনার বাচ্চাদের হত্যা করবেন না।'

সে বলল, 'ছোট থেকে আমি ওদের বড় করেছি। বড় হওয়ার পর বদরে আপনারা তাদের হত্যা করেছেন। তাদের সম্পর্কে আপনিই ভালো জানেন!'

জবাব শুনে উমর (রা.) জোরে হেসে উঠলেন।

তিনি বললেন, 'মিথ্যা কলঙ্কের কাহিনী তৈরি করবেন না।'

সে বলল, 'আল্লাহর কসম, কলঙ্ক অসম্মানের, তবে কখনো কখনো তাকে আমল না দেওয়া ভালো।'

তিনি বলেন, 'সৎ কাজের জন্য আমার হুকুম তামিলে আমাকে আপনি অমান্য করবেন না।'

সে বলল, 'আপনার হুকুমই যদি তামিল না করব, তাহলে আমরা এতক্ষণ এখানে বসে থাকতাম না।'

রসুল (সা.) উমর (রা.)-কে বললেন, 'এদের আনুগত্য গ্রহণ করো।'

উমর (রা.) তাঁর হয়ে যখন তাদের আনুগত্য গ্রহণ করছিলেন, রসুল (সা.) তখন আল্লাহর কাছে তাদের জন্য মাগফেরাত কামনা করলেন। আল্লাহ যাকে যাকে তাঁর জন্য জায়েজ করেছেন তাঁরা অথবা তাঁর হারেমের কেউ ছাড়া রসুল (সা.) অন্য কোনো নারীকে স্পর্শ করতেন না; কোনো নারীকেও স্পর্শ করতে দিতেন না। আব্বান ইবনে সালিহ থেকে ইবনে ইসহাক বলেন, নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে নারীদের আনুগত্য গ্রহণ করা হতো: রসুলের (সা.) সামনে একটা পাত্রে পানি রাখা হতো, তাঁর সমস্ত শর্ত তারা গ্রহণ করলে তিনি পানিতে হাত ডুবিয়ে উঠিয়ে নিতেন, মেয়েরাও অবিকল তা অনুসরণ করত। তারপর তিনি শর্ত আরোপ করতেন এবং তারা তা গ্রহণ করলে তিনি বলতেন, 'আপনার আনুগত্য আমি গ্রহণ করলাম, যান।' ব্যস, আর কোনো কথা নয়।[৫২]

রসুলাল্লাহ (সা.) এর জীবনীর উপর যতগুলো গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে সিরাত ইবনে ইসহাক সবচেয়ে প্রাচীন, সবচেয়ে প্রামাণ্য ও গ্রহণযোগ্য হিসাবে স্বীকৃত। এ ঘটনাটি এখানে উল্লেখ করার উদ্দেশ্য হলো- এটা প্রমাণিত যে, রসুলাল্লাহ (সা.) এর নিকট নারীরা যখন দলে দলে বায়াত

৫২। সিরাত ইবনে ইসহাক, প্রথমা প্রকাশনী, পৃষ্ঠা- ৫৯৫-৯৬

নিতে এসেছেন তখন কিন্তু রসুলাল্লাহ (সা.) ও তাদের মাঝে কোনো কালো কাপড় বা পর্দা টাঙানো থাকত না, তারা নিজেদের আপাদমস্তক আবৃত করেও আসত না। শুধুমাত্র হিন্দাই কেবল নিজেকে আবৃত করে এসেছিল শাস্তির ভয়ে যেহেতু অতীতে সে রসুলাল্লাহর প্রাণপ্রিয় চাচা হামজা (রা.) এর কলিজা চিবিয়েছিল।

পুরুষের পাশাপাশি আলোচনা সভায় নারী

"সাদ ইবনে ওয়াক্কাস থেকে বর্ণিত, উমর (রা.) একদিন রসুলের ঘরে প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করলেন। সেই সময় তাঁর কাছে একদল কোরাইশ মহিলা ছিলেন। তারা উচ্চস্বরে রসুলাল্লাহর সাথে কথা বলছিলেন এবং কোনো বিষয়ে আরো অধিক দাবি করছিলেন। কিন্তু উমর (রা.) প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করলে তারা উঠে দ্রুত ভেতরে চলে গেলেন। রসুলাল্লাহ উমরকে (রা.) আসার অনুমতি দিলেন। তিনি তখন হাসছিলেন। উমর (রা.) বললেন, হে আল্লাহর রসুল! আল্লাহ আপনার হাসি স্থায়ী করুন। রসুল বললেন, যে সব মেয়েরা আমার কাছে ছিল তাদের কর্মকাণ্ড দেখে আমি বিস্মিত হয়েছি। কারণ তারা তোমার কণ্ঠ শুনেই দ্রুত ভিতরে চলে গেল। উমর বললেন, হে আল্লাহর রসুল! আপনাকে বেশি ভয় করা তাদের উচিত। তারপর বললেন, হে নিজেদের দুশমনেরা! তোমরা কি আমাকে ভয় পাও এবং আল্লাহর রসুলকে ভয় পাও না? তারা বললো, হ্যাঁ তাই, আপনি রসুলের চাইতে কর্কশ ও কঠোর। রসুল বললেন, যার হাতে আমার প্রাণ সেই মহান সত্তার শপথ! শয়তানও তোমাকে কোনো পথে চলতে দেখলে সে পথ ছেড়ে অন্য পথে চলে।"[৫৩]

৫৩। বোখারী ও মুসলিম

উপার্জনে নারী

নারীদেরকে সংসারকার্যের পাশাপাশি উপার্জন করার ক্ষেত্রে ইসলাম কোনো নিষেধজ্ঞা আরোপ করে না। তবে স্ত্রীর উপার্জনে স্বামীর কোনো অধিকার থাকবে না, সেটা স্ত্রী যেভাবে খুশি ব্যয় করতে পারবে। কোর'আনে আমরা দেখি শোয়াইব (আ.) বৃদ্ধ হয়ে যাওয়ার দরুন তাঁর দুই কন্যা ছাগল চরাতেন। তাঁদের একজনকেই মুসা (আ.) বিবাহ করেন। রসুলাল্লাহর নারী সাহাবিদেরও অনেকে বিভিন্ন পন্থায় উপার্জন করতেন। তাঁর প্রথম স্ত্রী উম্মুল মোমেনীন খাদিজা (রা.) ছিলেন একজন প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী। তিনি তাঁর সমুদয় সম্পত্তি আল্লাহর রাস্তায় কোরবানি করে দিয়েছিলেন।

নারীদের উপার্জন সংক্রান্ত আরো কিছু ঘটনা হাদিসগ্রন্থ থেকে তুলে ধরা হলো-

১. "সাদ ইবনে মুয়ায থেকে বর্ণিত, কাব ইবনে মালেকের এক মেয়ে সালা পর্বতের পাদদেশে বকরি চরাচ্ছিল। একটি বকরি আঘাতপ্রাপ্ত হলে সে সেটিকে পাথর দ্বারা জবাই করে। পরে রসুলকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন খাও।"[৫৪]

২. "সাদ ইবনে সাহল (রা.) থেকে বর্ণিত, এক নারী সাহাবি একখানা বুরদা নিয়ে আসলো। বুরদা হচ্ছে প্রান্তভাগে নকশা করা বড় চাদর। সে বললো, হে আল্লাহর রসুল! আমি আপনাকে পরিধান করার জন্য নিজ হাতে এ চাদর বুনেছি। রসুলাল্লাহ সেটি সাগ্রহে তার নিকট থেকে নিলেন ও তা পরিধান করে আমাদের কাছে আসলেন।" উল্লেখ্য, তিনি বুরদা তৈরি করে সেগুলো বিক্রি করতেন। মদিনার বাজার ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করতেন একজন নারী উম্মে শেফা (রা.)।[৫৫]

৩. জাবের থেকে বর্ণিত, নবী (সা.) উম্মে মুবাশশির আনসারীর খেজুর বাগানে প্রবেশ করে তাকে বললেন, "কে এ খেজুর বাগান তৈরি করেছে- মুসলিম না কাফের?" উম্মে মোবাশশির বললেন, "মুসলিম তৈরি করেছে।" তিনি বললেন, "কোনো মুসলমান যদি বৃক্ষরোপন করে কিংবা ফসল উৎপন্ন করে আর কোনো মানুষ, পশু বা অন্য কিছু তার

৫৪। বোখারী

৫৫। বোখারী

ফল খায় তাহলে তাও তার জন্য সাদকা হিসেবে গণ্য হবে।"[৫৬]

৪. "আসমা বিনতে আবু বকর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসুলাল্লাহ (সা.) যুবায়েরের জন্য যে ভূখণ্ড বরাদ্দ করেছিলেন আমি সেখান থেকে মাথায় খেজুরের আঁটি বহন করে আনতাম। ভূমিখণ্ডটি এক মাইল দূরে অবস্থিত ছিল। একদিন আমি আঁটি মাথায় করে আসার পথে রসুলাল্লাহ (সা.) এর সাথে দেখা হলো। একদল আনসার তাঁর সাথে ছিলেন। তিনি আমাকে তাঁর সওয়ারির পেছনে উঠিয়ে নেওয়ার জন্য আহ্বান জানালেন। কিন্তু পুরুষদের সাথে চলতে আমি লজ্জাবোধ করলাম।"[৫৭]

মতবিরোধ মেটাতে নারী পুরুষের পর্যালোচনা

"তাউস থেকে বর্ণিত, আমি ইবনে আব্বাসের সাথে ছিলাম। যায়েদ ইবনে সাবিত তাকে জিজ্ঞেস করলেন, ঋতুবতী মেয়েরা বায়তুল্লাহর 'তাওয়াফে বিদা' না করে ফিরে যাবে বলে কী আপনি মতামত দিয়ে থাকেন? ইবনে আব্বাস তাকে বললেন, তা যদি না হয় তবে অমুক আনসারী মহিলাকে জিজ্ঞেস করো, রসুল (স.) তাকে এরূপ কাজের আদেশ দিয়েছিলে কিনা? তাউস বলেন, যায়েদ ইবনে সাবিত ইবনে আব্বাসের কাছে ফিরে আসলেন। তিনি বলছিলেন, আমি দেখেছি আপনি সত্য ছাড়া কিছুই বলেননি।"[৫৮]

জনসমক্ষে নারীর পুরুষের সাথে একাকী সাক্ষাত

"আনাস ইবনে মালেক থেকে বর্ণিত, এক আনসারী মহিলা, নবী (স.) এর কাছে এসে তাঁর সাথে একাকী সাক্ষাত করলো। নবী (স.) বললেন, আল্লাহর শপথ! মানুষের মধ্যে তোমরাই আমার কাছে সর্বাধিক প্রিয়।[৫৯]

৫৬। মুসলিম- পানি সেচ অধ্যায়

৫৭। সহী বুখারি, কিতাবুন নিকাহ, অনুচ্ছেদ: মর্যাদাবোধ, ১১ খণ্ড, পৃষ্ঠা- ২৩৪; সহী মুসলিম, কিতাবুস সালাম, অনুচ্ছেদ: গায়ের মাহরাম মহিলাকে সওয়ারীর পেছনে উঠিয়ে নেওয়া...৭খণ্ড, পৃষ্ঠা- ১১

৫৮। মুসলিম

৫৯। বুখারি ও মুসলিম

প্রচলিত হেযাবকে যুক্তি দিয়ে খণ্ডন

উল্লিখিত কোর'আনের আয়াত ও হাদিসের সাথে কিছু কিছু যুক্তি তুলে ধরা হয়েছে। যা থেকে হেযাবের প্রকৃত নীতিমালা কেমন ছিল তা সুস্পষ্ট হয়েছে। কোর'আন, হাদিস ও ইতিহাসে এমন সুস্পষ্ট নির্দেশনা থাকা সত্ত্বেও নারীর হেযাব নিয়ে অতি বাড়াবাড়ি করা হয়েছে, নারীদেরকে বাক্সবন্দি করা হয়েছে। ধর্মীয় সকল কাজ থেকে তাদেরকে দূরে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। এবার সাধারণ জ্ঞান ও যুক্তিবোধ দিয়ে দেখানোর চেষ্টা করা যাক প্রকৃত হেযাব কেমন হওয়া উচিত।

একটু চিন্তা করে বলুন তো- হেযাব কি নারীর সৌন্দর্য ঢাকার জন্য নাকি যৌন-বাসনা, কু-প্রবৃত্তি ও লালসাসৃষ্টিকারী অঙ্গ ঢাকার জন্য দেওয়া হয়েছে? যদি উদ্দেশ্য হয় সৌন্দর্যকে আবৃত করা তাহলে কেন নারীকে প্রাপ্তবয়স্ক (যখন তার শরীর নির্দিষ্ট কিছু সৌন্দর্য প্রাপ্ত হয়) হবার পর থেকে হেযাব করতে বলা হলো? **(আবার বয়সের ভারে যখন সে যৌন আবেদন হারায় তখন তার হেযাবের ব্যাপারে কেন শীথিলতার সুযোগ দেওয়া হলো?)**[৬০] নারীর মুখমণ্ডলে যে সৌন্দর্য থাকে পুরুষের মুখমণ্ডলেও কি একই সৌন্দর্য থাকে না? আর শিশুদের মুখমণ্ডল তো আরও সুন্দর হয়। তাহলে পুরুষকে কেন মুখমণ্ডল আবৃত করতে বলা হলো না? প্রাপ্ত বয়সে পৌঁছানোর আগে নারীর হেযাবই বা কেন করতে বলা হলো না?

আমরা যদি প্রকৃতির দিকে তাকাই তবে দেখবো প্রকৃতি অপার সৌন্দর্য্যের আধার। রঙ-বেরঙের ফুল, ঝর্ণা, পাহাড়-পর্বত, আকাশের চাঁদ-তারা, রাতের স্নিগ্ধতা, ভোরের শিশির ইত্যাদি সবকিছুতেই সৌন্দর্য রয়েছে। আল্লাহ সেই সকল সৌন্দর্যকে ঢেকে রাখেননি। তাহলে নারীদের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত পর্দার বিধান দেওয়ার কারণ কী? এর কারণ হলো একজন নারী যখন পরিণত বয়সে পৌঁছায় তখন তার দৈহিক পরিবর্তন দেখা যায় এবং আল্লাহ নারীর দৈহিক গঠনই এমনভাবে করেছেন যে পরিণত বয়সে নারীর দেহের বিশেষ কিছু অঙ্গ পুরুষকে প্রলুব্ধ করে, পুরুষকে প্রভাবিত করে এবং তার মধ্যকার আদিমপ্রবৃত্তিকে জাগ্রত করে। এর ফলে নারীদের অতিরিক্ত বিধান হিসেবে সেই বিশেষ অঙ্গগুলোকে ঢেকে রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যেন পুরুষের মধ্যকার লালসা জাগ্রত না হয় এবং এর ফলে কোন বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি না হয়।

৬০। সুরা আহযাব: ৬০

লক্ষ করুন- আল্লাহ হেযাবের আয়াতগুলোতে **দৃষ্টি সংযত করতে বলেছেন, লজ্জাস্থানের হেফাজত করতে বলেছেন। এ নির্দেশ নারী-পুরুষ উভয়ের জন্যই**।[৬১] নারী যদি সম্পূর্ণরূপে নিজেকে আবৃতই রাখবে তাহলে পুরুষের দৃষ্টি সংযত করার প্রয়োজন আসছে কেন? আর নারীরও যখন দৃষ্টি সংযত করার প্রশ্ন তাহলে পুরুষকে কেন বোরখা পরা লাগবে না? মুখমণ্ডলের সৌন্দর্যের কথা যদি বলি তাহলে একজন নারী মাহরাম এবং গায়রে মাহরাম উভয়ের নিকট একইরকম সুন্দর কিন্তু মাহরাম পুরুষ কখনোই তার দিকে লালসার দৃষ্টি নিয়ে তাকাবে না কিন্তু গায়রে মাহরাম যদি তাকে হেযাব বাদে দেখে তাহলে তার ভেতরে কু-প্রবৃত্তির জন্ম হবে।

তাহলে নারীর যে অঙ্গগুলো পরপুরুষের মধ্যে যৌন আবেদন সৃষ্টি করে সেই অঙ্গগুলোর ব্যাপারে সচেতন করার কথাই কি মহান আল্লাহ বলবেন না? কিন্তু আল্লাহ পবিত্র কোর'আনে অশালীন ভাষা ব্যবহার করতে পারেন না। তাই শালীন ভাষায় বলেছেন, **"তারা যেন তাদের কাপড়টাকে সামনে টেনে নেয়"**[৬২], **"গোপন সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে, দৃষ্টিকে সংযত করে, লজ্জাস্থানের হেফাজত করে, জোর পদক্ষেপ ফেলে গোপন সাজসজ্জা প্রদর্শন না করে (অর্থাৎ খারাপ নারীরা যেভাবে শরীর বাঁকিয়ে, নিতম্ব দুলিয়ে যৌন আবেদন সৃষ্টির জন্য হাঁটে।)"**[৬৩]

সকল ফকিহগণ এ ব্যাপারে একমত যে, সালাহ (নামাজ) ও হজের এহরাম বাঁধার পর মুখ খোলা রাখা বাধ্যতামূলক। আর রসুলাল্লাহ (সা.) এর সময় পাঞ্জেগানা সালাহসহ জুমা, ঈদ, জানাজা সকল সলাতেই নারীদের অংশগ্রহণ ছিল স্বতঃস্ফূর্ত (হাদিসের আলোকে উপরে বর্ণনা করা হয়েছে) আর হজে রসুলাল্লাহর সময় থেকে এখন পর্যন্তও নারীরা পুরুষের পাশাপাশি অংশগ্রহণ করে আসছে। তাহলে মুসলমানদের প্রধান সমাবেশগুলোতেই যখন নারীদেরকে মুখ খোলা রাখতে বলা হচ্ছে (যেখানে সবচেয়ে বেশি মানুষের জমায়েত) কেন স্বাভাবিক জীবনযাপনের ক্ষেত্রে নারীদেরকে মুখ ঢেকে চলতে হবে? তাছাড়া সালাহ হলো ইসলামি সমাজের মডেল। রসুলাল্লাহর যুগের সালাহ দেখলেই বোঝা যায় সেই সমাজ কেমন ছিল।

৬১। সুরা নুর: ৩০-৩১

৬২। সুরা আহযাব: ৫৯

৬৩। সুরা নুর: ৩০-৩১

সালাতে সাদা-কালো, ধনী-দরিদ্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, মুহাজির-আনসার, নারী-পুরুষ সকলেই এক জামায়াতে ঐক্যবদ্ধ হয়ে আল্লাহর সামনে দাঁড়াত। সালাতের এ ঐক্য, সাম্য তাদের সমাজেও প্রতিষ্ঠিত ছিল। নারীরা সালাতে অংশগ্রহণ করা মানেই সমাজের সকল কাজেও অংশগ্রহণ করা। নারীরা সালাতে মুখমণ্ডল খোলা রাখা মানেই সমাজেও সে মুখমণ্ডল খোলা রেখে চলতে পারবে। আর হজে নারীদের অংশগ্রহণ থেকে কী শিক্ষা পাওয়া যায়? যেখানে হাজার হাজার মাইল দূর-দূরান্তের নারীরাও এসে অংশগ্রহণ করবে। এ থেকে বোঝা যায় উম্মতে মোহাম্মদীর নারীরা ছিল বহির্মুখী। কাজেই নারীদের গৃহবন্দি করে রাখার কোনো সুযোগ নেই, তাদের মুখমণ্ডল আবৃত করার তো প্রশ্নই আসে না।

শুধুমাত্র নারীদের মুখমণ্ডল দেখে কিছু পুরুষের মধ্যে খারাপ ইচ্ছা জাগ্রত হবে না এমন নয়। নারীর মুখমণ্ডল দেখে যে পুরুষের মনে খারাপ বাসনা জাগ্রত হয় তার দায় সেই পুরুষেরই, ঐ নারীর নয়, কারণ পুরুষটি তার দৃষ্টিকে সংযত রাখতে ব্যর্থ। নিষ্পাপ শিশুকে দেখেও তো বলাৎকারকারী পুরুষের মনে খারাপ ইচ্ছা জাগ্রত হয়, তাই বলে কি শিশুকেও বোরখা পরিয়ে রাখতে হবে নাকি ঐ নরপশুদের কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে?

হেযাবের দায় কেন শুধু নারীদের উপর চাপানো হলো?

কোর'আন ও হাদিসের নির্দেশনা থেকে আমরা জানতে পারি যে, হেযাবের হুকুম নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্যই। নারী ও পুরুষ পরস্পরের প্রতি যেন অনৈতিকভাবে আকৃষ্ট না হয়ে পড়ে সেজন্য নারীর যেমন কিছু করণীয় রয়েছে তেমনি পুরুষেরও করণীয় রয়েছে। কিন্তু বর্তমানে আমরা দেখতে পাই হেযাবের সকল দায় কেবল নারীদের উপরেই চাপানো হয়। নারীদেরকে এমনভাবে বোরখাবৃত করা হয় যেন পুরুষের আর দৃষ্টি সংযত করার প্রয়োজনই না হয়। তবুও কিন্তু ধর্ষণের ঘটনা এড়ানো যাচ্ছে না। অনেকে বলতে পারেন আলেম সাহেবরা যেমন হেযাব চান তেমন হেযাব তো আমরা প্রতিষ্ঠা করতে পারিনি, পারলে নিশ্চয় ধর্ষণ, ব্যভিচার এড়ানো যেত। তাদের উদ্দেশে কথা হলো- আরব দেশগুলোতে তো হেযাবের বিধান পূর্ণরূপে কার্যকরী, তাহলে বাংলাদেশসহ অন্যান্য দরিদ্র দেশ থেকে গৃহকর্মীর কাজ করতে যাওয়া নারীদের উপর তাদের যৌন নিপীড়নের ঘটনা কেন ঘটে? কারণ তাদের পুরুষদেরকে দৃষ্টি সংযত করা ও যৌনাঙ্গের হেফাজত করার শিক্ষা দেওয়া হয় না। এ প্রসঙ্গে একটা গল্প বলা যেতে পারে (কাল্পনিক গল্প)-

একবার একটা ব্যাগের মধ্যে কয়েকটা মুরগির বাচ্চা নিয়ে রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন এক লোক। ব্যাগটা এমন ছিল যে মুরগির বাচ্চাগুলো মাথা বের করে বাইরের আলো-বাতাস নিতে পারে। যেতে যেতে একটা জায়গাতে গিয়ে দেখা যায় কয়েকটা কুকুর লোকটির দিকে লোভাতুর দৃষ্টি নিয়ে আগাচ্ছে। জিহ্বাটা এক হাত লম্বা হয়ে ঝুলে পড়েছে, অনবরত লালা ঝরছে আর গুটি গুটি পায়ে লোকটির দিকে অগ্রসর হচ্ছে।

লোকটি বুঝলেন তার হাতের মুরগিছানাগুলোর প্রতি তাদের এ লালসা। পেছনেই কুকুরের মালিক দাঁড়িয়ে আছে। তাকে বললেন- আপনার কুকুরকে সামলান, অন্যের জিনিসের প্রতি এমন লালসা ভালো নয়। তাদেরকে এ শিক্ষা দেন না? জবাবে মালিক লোকটি বলল- তার কুকুরের কী দোষ? আপনার মুরগিছানাগুলোকে যদি একটা কাঠের বাক্সের মধ্যে করে নিয়ে যেতেন তাহলে তো আর কুকুরগুলো তা দেখতে পেত না। হাড্ডি দেখলে সে তো লালায়িত হবেই।

পরদিন লোকটাকে শুধু শিক্ষা দেবার জন্য একটা কাঠের বাক্সে মুরগিছানা নিয়ে লোকটি যেতে লাগলেন, এবারও কুকুরগুলো ঠিক ঘ্রাণ পেয়েছে আর মুরগিছানাগুলোর কিচিরমিচির ডাক শুনে আগের দিনের মতো আচরণ শুরু করে। যা দেখে লোকটি আবার বলেন- ভাই, আপনার কুকুরগুলোকে একটু শিক্ষা দেন, যেন তাদের লালসাকে তারা নিবৃত্ত করে। লোকটি এবারও বলল- দেখুন ভাই, আপনার মুরগিছানাদের দোষ আছে, তারা কেন কিচিরমিচির করে? তাদেরকে কি জীবনের মায়া নেই?

লোকটি বুঝলেন তাকে বলে লাভ নেই। কুকুরের জন্য চাই মুগুর। এ রাস্তা দিয়ে যেতে হলে একটা মুগুর নিয়ে যেতে হবে। কুকুর এদিকে আগালেই মুগুর দিয়ে কয়েকবার কষে মারলে তাদের শিক্ষা হবে। ঠিক একইভাবে যে সমস্ত পুরুষ নিজের দৃষ্টিকে সংযত করতে পারে না, নারীদের দেখলেই কু-চিন্তা কাজ করে তাদের জন্য মুগুর লাগবে।

কোথা থেকে আসলো সর্বাঙ্গ আবৃত করা এ হেযাব?

আজকের দুনিয়ায় সর্বাঙ্গ আবৃত করা হেযাব, পর্দা, বোরখা ব্যবহারের রীতি রেওয়াজকে ইসলামের অন্যতম বাধ্যতামূলক বিধান বলে চিহ্নিত করা হলেও দুনিয়াতে এ প্রথা ইসলাম আনেনি, রসুলাল্লাহ (সা.) নারী সমাজের উপর এমন ব্যবস্থা চাপিয়ে দেওয়া হয়নি। হাজার হাজার বছর পূর্ব থেকেই এ প্রথা দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে, সমাজে প্রচলিত ছিল। এ উপমহাদেশে যেমন হরপ্পা, মাহেঞ্জোদারো প্রাচীনতম মানবসভ্যতা ছিল, তেমনি মেসোপটেমিয়া নামে আরেকটি মানবসভ্যতা ছিল বর্তমানের মধ্যপ্রাচ্যে। খৃষ্টপূর্ব পাঁচ হাজার অব্দ থেকে সূচনা হয়ে সে সভ্যতা খৃষ্টপূর্ব তিন হাজার অব্দে পূর্ণতা লাভ করেছিল। মেসোপটেমিয়া সভ্যতা বর্তমান উত্তর ইরাকের দজলা এবং ফোরাত নামক দুই বিষম উর্বরা নদীর মধ্য ভূখণ্ডে অবস্থিত ছিল। এ সভ্যতা অ্যাসিরিয়া নামক জাতিদের সময়ে এসে তখনকার দুনিয়ায় জ্ঞানে-বিজ্ঞানে চরম উৎকর্ষ সাধন করেছিল। সে সময়ে জ্ঞানে-বিজ্ঞানে উন্নত আসিরিয়ানগণ যুদ্ধ-বিগ্রহে লব্ধ পরাস্ত পুরুষদের দাস এবং নারীদের তারা দাসী, বাঁদী, রক্ষিতা করে রাখত। দাস-দাসীর এত পর্যাপ্ততা থাকায় অভিজাত নারীদের জন্য খাওয়া-দাওয়া, ঘুমানো আর আমোদ-ফূর্তি করা ছাড়া কোনো কর্ম করার দরকার

ছিল না। এ সময় নারীদের অভিজাত শ্রেণী হিসাবে মর্যাদাবান রাখতে বাইরে চলাচলরত দাসী, বাঁদী, পতিতা, রক্ষিতাদের থেকে আলাদা করে রাখার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে। এ প্রয়োজনীয়তা থেকে তারা নারীদের বাইরে যাবার বিষয় আইন করে সীমাবদ্ধ করে দিয়েছিল।

এইসব অভিজাত শ্রেণীর নারীরা কালে ভদ্রে বাইরে বের হওয়ার অনুমতি পেলেও- বাইরের সাধারণ নারীদের থেকে পার্থক্য প্রকাশ করতে, তাদের বিশেষ পোশাক পরে মাথা এবং মুখ ঢেকে বের হতে হত। যদি কেউ কোনো কারণে মাথা মুখ না ঢেকে বাইরে বের হয়ে পড়ত তখন তাঁকে আইন অমান্য করার অপরাধে শাস্তি দেওয়া হত। এ প্রথা শুধু আসিরীয়দের মধ্যে ছিল তা নয়, এ প্রথা সুমেরীয়, ব্যাবেলিয় পরে পার্সিয়ানদের মধ্যেও প্রচলিত ছিল।

৫৩৯ খৃষ্টপূর্ব অব্দে যখন প্রথম বারের মতো পার্শিয়ানরা আসিরীয়দের রাজধানী মেসোপটেমিয়া দখল করে বিজয়ীর বেশে নগরে প্রবেশ করে, তখন রাস্তায় চলাচলকারী সাধারণ বেশভূষা পরিহিত নারীদের মধ্যে ২/১ জন নারীকে বিশেষ পোশাক পরা এবং মাথা, মুখ ঢেকে চলাচল করতে দেখে। তখন তারা জানতে পারে যে, আসিরীয়দের অভিজাত নারীরা ঘরের বাইরে আসে না, কোনো কারণে আসলে তারা যে অভিজাত পরিবারের নারী তা পথচারীদেরকে জ্ঞাত করতে তারা তাদের মাথা এবং মুখ ঢেকে রাখে। পার্সিরাও আভিজাত্যের প্রতীক হিসাবে তাদের নারীদের মধ্যেও এ প্রথাকে গ্রহণ করে।

কালক্রমে পার্সি-সাম্রাজ্য বিস্তার এবং বর্ধিত আকার ধারণের সাথে সাথে নববিজিত এলাকার অভিজাত শ্রেণীর লোকেরাও এ প্রথাকে গ্রহণ করে নেয়। পরবর্তীতে পার্সিদের হাত ধরে এ প্রথা ভূমধ্য সাগরের পূর্ব পাশের দেশসমূহ সিরিয়া, লেবানন ও উত্তর আরবে ছড়িয়ে পড়ে, কিন্তু বিস্তীর্ণ মরুময় দুর্গম বালিয়াড়ি টিলা-টক্করের জন্য আরবের অন্যান্য অঞ্চলের সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থা দুর্গম থাকার কারণ, আরবের সর্বত্র এ প্রথা প্রসার লাভ করতে পারে না, ইসলাম যখন পার্সিয়ান সাম্রাজ্যের অংশবিশেষ দখল করে তখন থেকে আরবের এ এলাকার মানুষজন এ প্রথার সাথে পরিচিতি লাভ করে। এ অঞ্চলের অভিজাত নারীরা পূর্ব থেকেই এ প্রথা মেনে আসছিল। পারস্য অঞ্চলের মানুষ দলে দলে নিজেদের অগ্নি-উপাসনার পূর্ব ধর্ম পরিত্যাগ করে নতুন ধর্ম ইসলাম গ্রহণ করে নিতে থাকে কিন্তু তাদের পূর্বের বহু রীতি-

রেওয়াজ তাদের মধ্যে থেকে যায়। পরবর্তী দীর্ঘ সময় উমাইয়া, আব্বাসিয় খেলাফতকালে ইসলামের রাজধানী ছিল সিরিয়া, ইরাক অঞ্চল। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ইসলামের রীতি-রেওয়াজগুলো ছড়ানোর পেছনে এ অঞ্চলের মানুষের ভূমিকা ছিল অগ্রণী।

অপরদিকে মহান আল্লাহ নবী-পরিবারের সম্মান ও পবিত্রতা রক্ষার জন্য হেযাবের যে নীতি ঠিক করে দিয়েছেন তা এই অভিজাতদের প্রচলিত নেকাব-রীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যশীল। ইসলাম গ্রহণকারী নারীরা স্বাভাবিকভাবেই নবীপরিবারকে অনুসরণ করত। এর ফলে একটা শ্রেণি তৈরি হলো যারা সর্বাঙ্গ আবৃতকারী এ হেযাবরীতি অনুসরণ করতে লাগল। যারা এটা অনুসরণ করত না তারাও ভাবতে লাগল এটাই উত্তম কিন্তু আমরা তা অনুসরণ করতে পারছি না।

এদিকে ইসলামের মূল আকিদা হারিয়ে জাতি যখন ঘরমুখী, জেহাদবিমুখ তখন এ জাতির আলেম-ওলামাদের প্রধান কাজই ছিল দীন নিয়ে বাড়াবাড়ি, অতি-বিশ্লেষণ, খুঁটি-নাটি বিষয়ের অতি ব্যাখ্যা ইত্যাদির মাধ্যমে নতুন নতুন মাসলা-মাসায়েল তৈরি করা আর এগুলো নিয়ে অন্যান্য আলেম-ওলামাদের সাথে তর্ক-বাহাসে লিপ্ত হওয়া। এ সময়ে এসে সহজ-সরল হেযাব-রীতিকে অতি ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও বাড়াবাড়ি করে ফকিহরা আপাদমস্তক আবৃতকারী হেযাবে রূপ দিয়ে দিল, যা আজও পৃথিবীব্যাপী প্রচলিত।

আপাদমস্তক পর্দা সম্পর্কে প্রখ্যাত তথ্যবিদদের বক্তব্য

আজ থেকে প্রায় একশ বছর আগে প্রকাশিত "প্রবাসী" পত্রিকা থেকে-

নিখিল বঙ্গীয় মুসলিম যুবক সম্মেলনে ভাষাবিজ্ঞানী ড. মোহাম্মদ শহীদুল্লাহর ভাষণ:

"ভারতবর্ষে যেরূপ কঠোরতার সহিত পর্দার প্রচলন আছে, মুসলিম জগতে কোথাও এরূপ নাই। আরব, সিরিয়া, তুরস্ক, পারস্য, আফগানিস্তান, মিশর ও মরক্কো প্রভৃতি মুসলিম দেশসমূহে এত কঠোরতা সহকারে পর্দা পালন করা হয় না। বর্তমানে তুরস্ক, মিশর প্রভৃতি দেশে পর্দার আদৌ প্রচলন নাই। এছাড়া অন্যান্য স্বাধীন মুসলিম রাজ্যে হাট-বাজারে রমণীগণকে ক্রয়-বিক্রয় করিতে দেখা যায়। এমন কি ইসলামকেন্দ্র আরবেও ভারতের ন্যায় পর্দা সম্বন্ধে এত বাড়াবাড়ি নাই।

"শত শত বৎসর ধরিয়া আরব, পারস্য ও আফগানিস্তানের আচার-ব্যবহার ও প্রথার সঙ্গে ইসলাম নানাভাবে রূপান্তরিত হইয়া ভারতে তথাকথিত মোল্লাদিগের নিকট আমরা ইসলামের যে স্বরূপ পাইয়াছি, বাস্তবিক ইসলামের ইহা খাঁটি স্বরূপ নয়, ইহা ইসলামের ধার করা জিনিস। ভারতে কোনোদিন পর্দা প্রথার প্রচালন ছিল না। চতুর্দশ শতাব্দীতে তৈমুর লঙের আকক্রমণ হইতে এ দেশের সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে পর্দা প্রভাব বিস্তার করিতে থাকে।"

"ইসলামে নারীকে তার উপযুক্ত অধিকার দেওয়া হয়েছে- এ দাবি জগতের কাছে করলে তারা ঠাট্টা করবে। কারণ জগত দেখবে না ইসলামের কেতাব, দেখবে শুধু মুসলিমের ব্যবহার। যদি নারীর শিক্ষা ও অধিকারের কথা উঠল, তবে পর্দার কথা এখানে তোলা অন্যায় নয়। পর্দা দু-রকম- এক রকম ইসলামি পর্দা, সে হচ্ছে মুখ হাত পা ছাড়া সর্বাঙ্গ ঢাকা, আর এক অনইসলামি পর্দা, সে মেয়েদের চার-দেওয়ালের মধ্যে চিরজীবনের জন্য কয়েদ করে রাখা। ইসলামি পর্দায় বাইরের খোলা হাওয়ায় বেরুন কি অন্যের সঙ্গে দরকারি কথাবর্তা মানা নয়; অনইসলামি পর্দায় এসব হবার জোটি নেই। আমাদের প্রাণপণ চেষ্টা করতে হবে এই অনইসলামি পর্দা ফাঁক করে দিতে। তা না হলে আমাদের নারী হত্যার মহাপাপ হবে।"

হেযাব নিয়ে বিভক্ত নারীসমাজ

বর্তমানে মুসলিম নারীরা হেযাব পালনের ক্ষেত্রে কয়েকভাগে বিভক্ত। একদল এমনভাবে হেযাব করছে যে গৃহের বাইরে তারা একেবারেই বের হন না। নিতান্তই যদি বের হতে হয় তাহলে চোখ-মুখ, হাত, পা এমনভাবে ঢেকে রাখে যেন কেউ চোখের তারাটাও দেখতে না পারে। তারা বাড়ির মধ্যেও দেবর, ভাসুর, দুলাভাই ইদ্যাদি নিকট-আত্মীয় কিন্তু গায়রে মাহরুমের সামনেও এ হেযাব মেনে চলে বা চলার চেষ্টা করে। আর দ্বিতীয় ভাগটি হেযাব করার চেষ্টা করে কিন্তু পারিপার্শ্বিক নানা কারণে উপরোক্তদের মতো হেযাব করতে পারে না বলে মনে মনে অনুতপ্ত থাকে, নিজেকে অপরাধী বিবেচনা করে মনে মনে কষ্ট পায় ও এমন হেযাব যারা করে তাদেরকে অনেক বেশি সম্মান করে। তৃতীয় ভাগটি হেযাবের এ নীতি দেখে ইসলামকেই ঘৃণা করা শুরু করেছে। পাশ্চাত্যদের প্রচার ও জীবনদর্শন দ্বারা তারা প্রভাবিত হচ্ছে। তারা ভেবে দেখেছে যে, নিজেদেরকে ঐ হেযাবের নীতির মধ্যে আবদ্ধ করা সম্ভব নয় কাজেই এটা পরিত্যাগ করতে হবে।

ইসলামের মতো দ্রুত কোনো আদর্শ বিশাল ভূখণ্ডে ছড়িয়ে পড়েনি। এ গতিশীলতার একটা কারণ হলো উম্মতে মোহাম্মদীর বহির্মুখী, সংগ্রামীচরিত্র আর দ্বিতীয় কারণটা হলো- ইসলামের বিধি-বিধানগুলো এতটাই সহজ, সরল, সাবলীল ও যৌক্তিক যে, কেউ যখন ইসলামের বিধি-বিধানগুলো দেখেছে তখন নিজে থেকেই আলিঙ্গন করে নিয়েছে। এর ফলে কোনো অঞ্চলে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হবার পর ঐ অঞ্চলের সাধারণ মানুষের দ্বারা ব্যাপক প্রতিরোধের সম্মুখিন হতে হয়নি বরং দলে দলে সাধারণ মানুষ ইসলামকে আলিঙ্গন করে নিয়েছে। তাহলে বর্তমানে কেন ইসলামের বিধি-বিধানগুলো মানুষের কাছে এমন কষ্টদায়ক হয়ে গেল? কেন নারীরা ইসলামকে ছেড়ে পাশ্চাত্যদের জীবনদর্শনের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে? এটা কি ব্যর্থতা নয়?

ইসলামের একটা মৌলিক নীতি হলো- ঐক্য। ইসলাম মানবজাতিকে ঐক্যবদ্ধ করতে এসেছে, নারী ও পুরুষকে বিয়ের মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ করে একে অপরের সাথে গভীর সম্পর্ক স্থাপন করে দিয়েছে। কাজেই ইসলাম বর্ধিত পরিবার-ব্যবস্থাকে উৎসাহিত করে। আপনারা পাঁচ ভাই যদি এক হাড়িতে মিলেমিশে খেতে পারেন তবে সেটাই উত্তম হবে। শিশুরাও এ পরিবারব্যবস্থা থেকে ঐক্য, ভ্রাতৃত্ব, ভালোবাসার শিক্ষা পাবে। এবার একটু

ভেবে দেখুন তো- যদি গায়রে মাহরুমের সামনে মুখ, হাত ইত্যাদি ঢেকে রাখতে হয় তাহলে একপরিবার হয়ে বসবাস করা সম্ভব কি না? নিশ্চয় অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু ইসলাম তো সহজ-সরল দীন, এটাকে এমন কঠিন, দুর্বহ করল কে?

হেযাবের ফল কী হয়েছে?

সহজ-সরল হেযাবকে আপাদমস্তক আবৃতকারী হেযাবে রূপ দেওয়ার ফল কী হয়েছে? সমাজ থেকে কি অশ্লীলতা দূর হয়ে হয়েছে? ধর্ষণসহ যাবতীয় পাপাচার বন্ধ হয়েছে? নাকি আরও বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে? যে উদ্দেশ্যে এ প্রক্রিয়ার প্রবর্তন করেছে আলেম-ওলামারা সেটা তো হয়ই নাই, বরং এর কারণে নারীসমাজ প্রকৃত ইসলামের শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণে নিজেদের সমাজের কল্যাণে, জাতির কল্যাণে, ইসলামের কল্যাণে ব্যবহৃত করতে পারছেন না, নিজেদের নিরাপদও রাখতে পারছেন না। উল্টো তারা সংকীর্ণ মনোভাবাপন্ন, বিকৃত ইসলামের চর্চায় বিপথগামী হয়েছে।

সমস্যার সমাধান ইসলামেই আছে

মনে রাখতে হবে ইসলামের প্রত্যেকটা নীতিই কল্যাণকর। এ কল্যাণ তখনই পূর্ণরূপে পাওয়া যায় যখন ইসলাম নামক জীবনব্যবস্থাটি ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জীবনে প্রতিষ্ঠা করা হয়। বর্তমানে মানুষের জীবনের সকল অঙ্গনে চলছে পাশ্চাত্য ইহুদি-খ্রিষ্টানদের তৈরি করা জীবনব্যবস্থা। সুদভিত্তিক, পুঁজিবাদী অর্থনীতি, মানবরচিত আইন-বিধান, হানাহানির রাজনীতি, চরম ভোগবাদী জীবনদর্শন, অশ্লীল ও নোংরা সমাজব্যবস্থা এক কথায় জাতীয়-আন্তর্জাতিক ও সামাজিক সকল অঙ্গনে চলছে পাশ্চাত্যদের প্রতারণামূলক এক জীবনব্যবস্থা যা মানুষের ব্যক্তিগত জীবনকেও প্রভাবিত করছে প্রতিনিয়ত। অন্যদিকে ব্যক্তিগত জীবনের একটা ক্ষুদ্র পরিসরে মানুষ কিছু আচার-ব্যবহারকেই ধর্মজ্ঞান করে তা পালন করে চলেছে। এই ক্ষুদ্র পরিসরেও যে রীতি-রেওয়াজগুলো পালন করা হচ্ছে তাও আবার অতি বাড়াবাড়ি করে বিকৃত করে ফেলা হয়েছে। এমতাবস্থায়

মুক্তির জন্য মানুষের প্রথমত এ বিকৃতিগুলো দূর করে ইসলামের প্রকৃত রূপটি ফিরিয়ে আনতে হবে, এরপর সেই প্রকৃত রূপটি সংগ্রামের মাধ্যমে মানবসমাজে প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

আল্লাহর রহম মহান আল্লাহ টাঙ্গাইলের ঐতিহ্যবাহী পন্নী পরিবারের সন্তান এমামুয্‌যামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নীকে ইসলামের সেই সঠিক রূপটি বুঝিয়ে দিয়েছেন। যা তিনি মানুষকে বুঝিয়ে দিয়ে ২০১২ সনে আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে যান। এখন আমরা সংগ্রাম করে যাচ্ছি প্রকৃত ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য। এখানে কেবল হেযাব কীভাবে আমাদের সমাজকে ধর্ষণ, ব্যভিচার, ইভটিজিং জাতীয় নারী নির্যাতনমূলক অপরাধ থেকে মুক্তি দিতে পারে সেটাই তুলে ধরব।

যে কোনো অপরাধ দূর করতে হলে ভারসাম্যপূর্ণ বিধান লাগে। চুরি বন্ধ করতে হলে প্রথমে মানুষের অভাব দূর করতে হবে যেন কেউ চুরি করতে বাধ্য না হয়। এরপর আত্মিকভাবে প্রত্যেককে চুরি না করার শিক্ষা দিতে হবে, যেন ভেতর থেকে প্রতিটা মানুষের আত্মা চুরি করার ব্যাপারে বাধা সৃষ্টি করে। এরপরও কেউ চুরি করলে তার উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। এই হলো ভারসাম্য। একইভাবে সমাজ থেকে ব্যভিচার, ধর্ষণ, ইভটিজিং জাতীয় অপরাধ দূর করতে হলে-

১. প্রথমত- যারা বিবাহের উপযুক্ত হয়েছে তাদের বিবাহ দিয়ে দিতে হবে এবং বিবাহ-পদ্ধতি সহজ করতে হবে যেন জৈবিক চাহিদা পূরণের জন্য কেউ অন্যায় পন্থা বেছে নিতে বাধ্য না হয়। এজন্য মহান আল্লাহ হেযাবের নির্দেশ দিয়ে পরবর্তী আয়াতেই বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে যারা বিবাহহীন, তাদের বিবাহ সম্পাদন করে দাও এবং তোমাদের দাস ও দাসীদের মধ্যে যারা সৎকর্মপরায়ণ, তাদেরও। তারা যদি নিঃস্ব হয়, তবে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে সচ্ছল করে দেবেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।[৬৪] প্রকৃত ইসলামে বিবাহ-পদ্ধতি ছিল অত্যন্ত সহজ। কেউ কাউকে পছন্দ করলে বিনা দ্বিধায় প্রস্তাব করতে পারত। পরস্পর রাজি থাকলে এবং তাদের আর্থিক সামর্থ কম থাকলে স্বল্প খরচেই বিয়ে হয়ে যেত। এমনও হয়েছে যে, একে অপরকে পছন্দ করেছে কিন্তু পাত্রের কাছে মোহরানা দেবার মতো কিছু নেই, তখন রসুলাল্লাহ

৬৪। সুরা নুর: ৩২

(সা.) কেবল কয়েকটি সুরা মুখস্থ করিয়ে দেবার শর্তে বিয়ের অনুমোদন দিয়েছেন। এর চেয়ে সহজ বিবাহ-পদ্ধতি আর কী হতে পারে?

২. দ্বিতীয়ত নারী-পুরুষ উভয়কে কামরিপু নিয়ন্ত্রণের জন্য নৈতিক শিক্ষা দিতে হবে। এই শিক্ষাই মহান আল্লাহ দিয়েছেন এ নির্দেশের মাধ্যমে যে, "যারা বিবাহে সামর্থ্য নয়, তারা যেন সংযম অবলম্বন করে যে পর্যন্ত না আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে অভাবমুক্ত করে দেন।"[৬৫] "তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখে, যৌনাঙ্গের হেফাজত করে, তাদের কাপড়কে বুকের উপর টেনে নেয় ইত্যাদি।"[৬৬] একজন মানুষ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে এ স্বাক্ষ্য দিয়ে যে, "আমি আল্লাহর হুকুম ছাড়া কারো হুকুম মানব না।" কাজেই একজন মো'মেন, মুসলিমের জন্য আল্লাহর এ নির্দেশ যথেষ্ট হবে কামরিপু নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে।

৩. তৃতীয়ত- এর পরও যারা সীমালঙ্ঘন করবে তাদের জন্য আখেরাতে তো ভয়ঙ্কর শাস্তি আছেই তবে দুনিয়াতেও কঠিন শাস্তির বিধান রয়েছে। আল্লাহ বলেন, "ব্যভিচারিণী নারী ব্যভিচারী পুরুষ; তাদের প্রত্যেককে একশো করে বেত্রাঘাত করো। আল্লাহর বিধান কার্যকর করতে গিয়ে তাদের প্রতি যেন তোমাদের মনে দয়ার উদ্রেক না হয়, যদি তোমরা আল্লাহর প্রতি ও পরকালের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে থাক। মুসলমানদের একটি দল যেন তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে।"[৬৭]

এ ভারসাম্যপূর্ণ বিধান যে সমাজে প্রতিষ্ঠা করা যাবে সেখানে আর এ অন্যায়গুলো হবে না। এভাবে প্রতিটা অন্যায়, অপরাধের জন্যই ইসলামে ভারসাম্যপূর্ণ বিধান রয়েছে। প্রকৃত ইসলাম হলো ভারসাম্যপূর্ণ জীবনব্যবস্থা (দীনুল ওয়াসাতা)। ইসলামের সঠিক শিক্ষাই পারে সমস্ত অন্যায়, অবিচার দূর করতে। যারা পাশ্চাত্যদের আলোর ঝলকানিতে আর নারী-স্বাধীনতা, নারী-অধিকার জাতীয় প্রতারণামূলক শব্দগুচ্ছের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ইসলাম থেকে দূরে সরে যাচ্ছেন তাদের জ্ঞাতার্থে বলছি- আপনাদের মুক্তি সেখানে নেই। নারীদের প্রকৃত সম্মান, প্রকৃত মর্যাদা, সত্যিকারের মুক্তি দিয়েছে ইসলাম।

৬৫। সুরা নুরঃ ৩৩

৬৬। সুরা নুরঃ ৩০-৩১

৬৭। সুরা নুরঃ ২

পাশ্চাত্যদের কাছে আত্মিক শিক্ষার কোনো গুরুত্ব নেই (তারা আত্মায় বিশ্বাসী না)। বিয়ে ব্যবস্থা তারা প্রায় বিলুপ্ত করে ফেলেছে। এবার অবাধ করে দিয়েছে যৌন সম্পর্ক। তাদের ধারণা- যেহেতু যৌন চাহিদা মিটানোর জন্য মানুষ অন্যের উপর জোর-জবরদস্তি করে তাই এটাকে অবাধ করে দিলে মানুষ আর কারো উপর জবরদস্তি করবে না, সুতরাং ধর্ষণও হবে না। আসলে রিপুগুলো এমন নয় বরং ঠিক এর উল্টো। প্রাপ্তিতে লালসা আরও বৃদ্ধি পায়, নিয়ন্ত্রণে তা কমে। কিন্তু শুধুই নিয়ন্ত্রণ অপ্রাকৃতিক, তাই ভারসাম্যপূর্ণভাবে অভাবও মেটাতে হবে। পাশ্চাত্যদের ঐ ধারণা যে ভুল এবং তাদের ঐ কার্যের ফল যে উল্টো হচ্ছে তা নিম্নের এ পরিসংখ্যানই প্রমাণ করে-

ভারতের নাম করা নিউজ পোর্টাল ২৪ঘণ্টা ২৫ অক্টোবর ২০১৬ তারিখে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে যা বাংলাদেশের দৈনিক যুগান্তর, বাংলাদেশ প্রতিদিনসহ প্রায় সবকটি জাতীয় দৈনিকে পরদিন প্রকাশিত হয়েছিল। প্রতিবেদনটি নিম্নে তুলে ধরা হলো।

বিশ্বে সবচেয়ে বেশি ধর্ষণের ঘটনা ঘটে আমেরিকায়। আমেরিকার ব্যুরো অব জাসটিস স্ট্যাটিস্টিক অনুযায়ী আমেরিকায় ধর্ষণের শিকার নারীর পরিসংখ্যান ৯১% এবং ৮% পুরুষ। ন্যাশনাল ভায়োলেন্স এগেইনস্ট উইম্যানের সার্ভে অনুযায়ী আমেরিকার প্রতি ৬ জন মহিলার মধ্যে ১ জন ধর্ষণের শিকার। পুরুষদের ক্ষেত্রে পরিসংখ্যানটা ৩৩ জনে ১ জন ধর্ষণের শিকার। এ দেশে ১৪ বছর বয়স থেকেই ধর্ষণের মতো অপরাধের প্রবণতা তৈরি হয় শিশু মননে। সন্তান এবং শিশুদের ওপর যৌন নির্যাতনের বিষয়ে দক্ষিণ আফ্রিকা গোটা পৃথিবীর মধ্যে দ্বিতীয়। এ দেশে ধর্ষণের শাস্তি মাত্র দুই বছরের জেল। ইউরোপের সুইডেনেই সবচেয়ে বেশি (৫৮%) ধর্ষণের ঘটনা ঘটে। তালিকায় তৃতীয় স্থনে আছে এই সুইডেন।

তালিকায় চার নাম্বারে আছে ভারত। ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ড ব্যুরো অনুযায়ী ২০১২ সালে ভারতে ধর্ষণের অভিযোগ জমা পড়ে ২৪ হাজার ৯২৩টি। দেশটিতে ধর্ষণের শিকার হওয়া ১০০ জন নারীর মধ্যে ৯৮ জনই আত্মহত্যা করেন। প্রতি ২২ মিনিটে ভারতে একটি করে ধর্ষণের অভিযোগ দায়ের হয়।

তালিকার পাঁচ নাম্বারে আছে ব্রিটেন। দেশটিতে চার লাখ মানুষ প্রতিবছর ধর্ষণের মতো ঘটনার শিকার হন এ দেশে। প্রতি পাঁচ জন মহিলার মধ্যে

একজন করে ধর্ষণের শিকার হন।

তালিকায় ষষ্ঠ স্থানে থাকা জার্মানিতে এখন পর্যন্ত ধর্ষণের শিকার হয়ে দুই লাখ ৪০ হাজার নারীর মৃত্যু হয়েছে। প্রতি বছর জার্মানিতে ধর্ষণের অভিযোগ দায়ের হয় ৬৫ লাখ ৭ হাজার, ৩৯৪। সপ্তম স্থানে আছে ফ্রান্স। ১৯৮০ সাল পর্যন্ত ধর্ষণের মতো ঘটনা ফ্রান্সে অপরাধ বলেই মানা হতো না। সরকারি গবেষণায় দেখা গেছে, প্রতি বছরে এই দেশে ধর্ষণের শিকার হন অন্তত ৭৫ হাজার নারী।

তালিকায় অষ্টম স্থানে থাকা কানাডায় এখনও পর্যন্ত লিখিত অভিযোগের সংখ্যা ২৫ লাখ ১৬ হাজার ৯১৮টি। প্রতি ১৭ জনের মধ্যে এক জন নারী এ দেশে ধর্ষণের শিকার হন।

নবম স্থানে থাকা শ্রীলংকায় অপরাধের শতাংশের বিচারে ১৪.৫ শতাংশ অপরাধ সংগঠিত হয় ধর্ষণের। ধর্ষণে অভিযুক্তদের ৬৫.৮% ধর্ষণের মতো নারকীয় কর্মকাণ্ডে লিপ্ত থেকেও কোনও প্রকার অনুশোচনা তাদের মধ্যে হয় না। ১০ নম্বরে থাকা ইথিওপিয়ায় ৬০% নারীই ধর্ষণের শিকার।

এই পরিসংখ্যান দেখে কেউ আমাকে বকা দিয়েন না, কারণ এই প্রতিবেদন আমার তৈরি নয়। এখনো গুগলে সার্চ দিলে অনেক নিউজ-লিংক পেয়ে যাবেন এই প্রতিবেদনের।

দিন বদলের হাওয়া

নারী-পুরুষ একসঙ্গে নামাজ আদায়ের আহ্বান কাবা শরিফের সাবেক ইমামের

নারী ও পুরুষদেরকে একসঙ্গে নামাজ আদায়ের আহ্বান জানিয়েছেন সৌদি আরবের মক্কার পবিত্র কাবা শরিফের সাবেক ইমাম শেখ আদিল আল-কালবানি। তিনি সৌদি ব্রডকাস্টিং করপোরেশনকে (এসবিসি) দেওয়া এক ভিডিও সাক্ষাৎকারে এ আহ্বান জানান বলে জানিয়েছে দেশটির সংবাদপত্র আরব নিউজ। আল-কালবানি নারী ও পুরুষদেরকে পার্টিশন ব্যবহার করে আলাদাভাবে নামাজ আদায় না করার পরামর্শ দিয়ে বলেন, মহানবী হজরত মুহাম্মদ (সা.) এর সময়ে কোনো পৃথকীকরণ ছিল না। তিনি জোর দিয়ে বলেন, ইসলামি ঐতিহ্যে বর্তমানের এ পৃথকীকরণ চর্চার কোনো ভিত্তি নেই। নারীদের অহেতুক মস্তিষ্ক বিকৃতির ফলে এমন হয়েছে। কাবা শরিফের এ সাবেক ইমাম বলেন, দুঃখজনকভাবে আজ নামাজের জায়গায় মসজিদে আমরা পৃথকীকরণ সৃষ্টি করেছি। তারা পুরুষদের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। তিনি বলেন, তারা পুরুষদেরকে দেখতে পারে না, মাইক্রোফোন বা স্পিকারের মাধ্যমে শুধু তাদের কথা শুনতে পারে। যদি যন্ত্রগুলো নষ্ট হয়ে যায়, তারা বুঝতেই পারবে না কী হচ্ছে? আল-কালবানি বলেন, মহানবীর সময়ে নারীরা ছিল সবচেয়ে সুরক্ষিত ও পরহেজগার। তখন পার্টিশন বা পর্দা ছাড়া মসজিদের সামনে পুরুষরা এবং পেছনে নারীরা দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় করতেন। তিনি বলেন, আজ নারীদের জন্য আলাদা কক্ষের ব্যবস্থা করা হয়েছে, যা মসজিদের মূল অংশ থেকে অনেক দূরবর্তী। আমি মনে করি এভাবে নারীদেরকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা হচ্ছে। দেশটির সাম্প্রতিক সংস্কারগুলো সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে কাবা শরিফের সাবেক ইমাম বর্তমানে নারীদের সামাজিক-আর্থিক উন্নয়নের প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, আমরা শুনতে চাই যে কোনো নারী উপ-প্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রদূত এবং অন্য উঁচু পদগুলোতে অধিষ্ঠিত হয়েছে।

পরিশিষ্ট

নারীর প্রতিভা আছে, মেধা আছে, সমাজে অবদান রাখার যোগ্যতা আছে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সাহস আছে; কিন্তু আজকের সমাজে তার সেই গুণগুলোর কোনো মূল্যায়ন নেই, কোনো স্বীকৃতি নেই। সে তার মেধা ও যোগ্যতাকে কাজে লাগানোর সুযোগ পাচ্ছে না। তাকে ধর্মের নাম করে, তার উপর সামাজিক বিধিনিষেধ আরোপ করে অবদমিত করে রাখা হচ্ছে, তাকে বিকশিত হতে দিচ্ছে না। সে এ অন্যায় অবস্থা, এ জাহেলিয়াতের কারাগার থেকে মুক্ত হওয়ার পথ খুঁজে পাচ্ছে না, কোনো উদ্ধাকারীর সন্ধানও তার জানা নেই। এজন্য নারীরা আজ নীরবে কাঁদে।

চৌদ্দশ বছর আগের আরবে নারীর একই অবস্থা ছিল। সেই কান্না থেকে তাদেরকে মুক্তি দিয়েছিলেন আল্লাহর রসুল। নারীরা কান্নাকাটি রেখে বীরাঙ্গনা হয়েছিলেন। যে হাতে নারী রুটি বানাত, সেই হাতকে রসুলাল্লাহ এত বলিষ্ঠ করে তুললেন যে তারাই বল্লম আর তলোয়ার চালিয়ে শত্রুর মনে ত্রাস সৃষ্টি করেছিলেন। রসুল তাদের মুখে ভাষা দিলেন, তাদের প্রাপ্য মর্যাদা দিলেন, শক্তি দিলেন। তারা তাদের মেধা যোগ্যতার প্রমাণ রাখল। সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে পুরুষদের পাশাপাশি নারীরাও অবদান রাখল। হাসপাতাল ব্যবস্থাপনায়, উপার্জনে, বাজার ব্যবস্থাপনায়, যুদ্ধে, মসজিদে এক কথায় জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে তাদের অবাধ বিচরণ রসুল নিশ্চিত করলেন।

আজ আবারও নারী নীরবে কাঁদছে। অলিখিত সিস্টেম, আচার-বিচার-কুসংস্কার ও প্রথাগুলো নারীদের অগ্রগতির জন্য বিরাট বাধা। যেমন আজ যদি গ্রামের কোনো নারীকে চিকিৎসক প্রতিদিন সকালে দৌড়ানোর পরামর্শ দেন তাহলে সে বিকৃত ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির কারণে তা করতে পারবে না। কিন্তু আল্লাহ-রসুলের ইসলাম তো তাকে এক্ষেত্রে কোনো নিষেধাজ্ঞা দেয়নি। আমরা হেযবুত তওহীদ চলমান অচলায়তন ও ফতোয়ার বেড়াজাল থেকে নারীদের মুক্ত করতে প্রকৃত ইসলামের শিক্ষাগুলো তাদের সামনে তুলে ধরে যাচ্ছি। কেবল শহরের সুবিধাপ্রাপ্ত নারীদেরকেই নয়, প্রত্যন্ত গ্রামের অশিক্ষিত অর্ধ-শিক্ষিত গৃহবধুকেও হেযবুত তওহীদ সামাজিক ও জাতীয় অঙ্গনে শক্তিশালী ভূমিকা পালনে যোগ্য করে গড়ে তুলতে চেষ্টা করছে। তাদেরকে নারী মানেই সুন্দরী সে আর নীরবে কাঁদতে হবে না যদি তারা হেযবুত তওহীদের কথা শোনে।

নারীর হেযাব

রূপ যে তাহার উপচে আসে
তাই তো খোদা দিলেন বিধান
হেযাব করার জন্য
হেযাব ছেড়ে কেন তুমি
হলে এমন বন্য?
পোশাক ছেড়ে পশুর মতো
কেন তুমি নগ্ন এত?
ভাবছ পুরুষ অকাতরে
ডুববে তোমার রূপসাগরে
ঢালবে টাকা গুনবে তুমি
নগ্ন হবার জন্য?
তবে যে বোন হলে তুমি
বাজারেরই পণ্য।
একি তুমি ভুত সেজেছ
হাত চোখ মুখ ঢেকে
এমন হেযাব কে শেখালো
পেলে কোথা থেকে?
কোরান বলে থাকবে খোলা
প্রকাশমান অঙ্গগুলা
টেনে নেবে লম্বা চাদর
মাথা থেকে বুকের উপর
মুখটি তোমার খোলা রবে
যেন চেনা যায়
এটাই হল খোদার বিধান
লজ্জা এতে নাই।